পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত সমাজ ও বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকা

জানুয়ারি-ডিসেম্বর 2004

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

দুহাজার চার-এর জাতীয় পরিবেশ নীতি

ধনঞ্জয়ের ফাঁসির প্রেক্ষাপটে মৃত্যুদণ্ডে চিকিৎসকের নৈতিক দায়িত্ব

চিকিৎসার পরম্পরাগত এক ধারা — কুশ পা চিকিৎসা

মেধাস্বত্ব নিয়ে কিছু কথা কিছু জিজ্ঞাসা

শান্তির নোবেল এবার কৃষ্ণাঙ্গ পরিবেশবাদীর

আন্টার্কটিকা ও মেরু প্রদেশ-এর কথা

তিন জুলাই-এর আলোচনাসভার বিস্তারিত প্রতিবেদন

With best compliments from

□□□

A WELL WISHER

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

বর্ষ 26 সংখ্যা 1-4 □ জানুয়ারি-ডিসেম্বর 2004

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী
P 252, লেকটাউন, ব্লক A
কলকাতা 700 089
ইমেল : b_o_b2004@hotmail.com

□

মূল্য : কুড়ি টাকা

□

ভুল সংশোধন :
জানুয়ারি-ডিসেম্বর 2003 সংখ্যায়
পৃষ্ঠা 1-এর প্রথম কলামে
জানুয়ারি-ডিসেম্বর 2004 বদলে
জানুয়ারি-ডিসেম্বর 2003 পড়তে হবে।

□

□

VIJNAN O VIJNANKARMI
Rn.No. 34929/79

□

Vol. XXVI Nos. 1-4
January-December 2004

□

Communication :
C/o Abhijit Lahiri
P 252, Lake Town, Block A
Kolkata 700 089
West Bengal INDIA

সূ চি প ত্র

আমাদের কথা □ 3
স্মরণ : প্রয়াত অজিত নারায়ণ বসুকে মনে রেখে □ 4
জাতীয় পরিবেশ নীতি দুহাজার চার □ 5
মৃত্যুদণ্ড : চিকিৎসকের অংশগ্রহণ ও নৈতিকতা □ 9
আইনসঙ্গত হত্যাকাণ্ডের (মৃত্যুদণ্ড) প্রতিবাদে রাষ্ট্রপতির কাছে চিঠি □ 15
চিকিৎসার লোকায়তিক ধারা—কুশ পা চিকিৎসা □ 24
প্রযুক্তি নিয়ে অগোছানো কথা □ 30
নোবেল শান্তি পুরস্কার দুহাজার চার □ 34
আন্টার্কটিকা □ 40
ওজোন হোল ও মেরু প্রদেশের জীবাণু □ 41

দর্পণে আত্ম-দর্শন
তিন জুলাই দুহাজার চার-এর আলোচনাসভা □ 43
টু বি অর নট টু বি ও বি □ 49
বিওবি-র অর্জন ও সম্ভাবনার দিশা নির্দেশে কিছু কথা □ 53
দায়িত্ব এড়াতে চাইলে মৃত্যু, কঠিন কাজ বাঁচা ও বাঁচানো □ 55

পরিক্রমা
স্পঞ্জ আয়রন কারখানা : স্পঞ্জের মতো শুষে নিচ্ছে মাটির তলার জল □ 63
তবু মাটি ছাড়বে না ওড়িশার কাশীপুরের মানুষ □ 64
ক্ষেপণাস্ত্রের পেছন গুঁতো □ 65

বইপত্র : পরিচিতি/পর্যালোচনা
প্রকৃতি-বান্ধব চাষাবাদ প্রসঙ্গে □ 66 অ্যান্টিবায়োটিক ও উদ্ভিজ্জ ওষুধ □ 67
সত্যিই কী আজও পুকুর আমাদের □ 69

চিঠিপত্র
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী সম্পর্কে কয়েকটি কথা □ 70 পৃথিবী পেরিয়ে..... □ 71

□ পত্রিকায় প্রকাশিত নামাঙ্কিত রচনার বক্তব্য ও মতামত সর্বক্ষেত্রে সম্পাদকমণ্ডলীর মতামত নয়।

Space Donated by :

A Well Wisher

আমাদের কথা

পত্রিকা যখন ছাপাখানায়, তখনই 26 ডিসেম্বর 2004 ভোর বেলায় ঘটে গেল এশিয়া ভূখণ্ডে স্মরণকালের মধ্যে সবথেকে ভয়ঙ্কর ও ব্যাপক বিপর্যয়। ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের কাছে সাগর তলে বিপুল ভূমিকম্প থেকে জাত 'সুনামি' নামক বিপুল সামুদ্রিক জলোচ্ছাস ভারত মহাসাগরের লাগোয়া প্রতিটি সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকাকে নিমেষে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, মায়ানামার, মালদ্বীপ, শ্রীলংকা, ও ভারতের উপকূলে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ মানুষ এক ঝটকায় হারিয়েছেন বাড়ি-ঘর-দুয়ার, জীবিকার উপকরণ (বিশেষভাবে মৎসজীবীরা) এবং আপনজন। এই লেখার সময় পর্যন্ত মৃতের সংখ্যাই দেড় লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে অর্থাৎ প্রাপ্ত মৃতদেহের সংখ্যা। আরও কত হাজার বা লক্ষ মানুষ প্রবল ঢেউএর টানে সমুদ্রগর্ভে স্রেফ 'হারিয়ে' (missing) গেছেন তার সংখ্যা এখনও গোণা যায় নি। সঠিকভাবে কোনোদিনই তা জানার সম্ভাবনাও নেই। যাঁদের প্রাণটুকু মাত্র রক্ষা হয়েছে এবং চলে গেছে আশ্রয় ও জীবিকার শেষ সম্বলটুকু সেই স্বজন-হারানো বিহ্বল মানুষের সংখ্যা যে কত কোটি তার হিসেব এখনও হয়নি। এর মধ্যে রয়েছে শিশুও, সুনামি যাদের রাতারাতি অনাথ করে দিয়েছে।

উৎপত্তিস্থল ইন্দোনেশিয়ার কাছে হওয়ায় সেখানেই লোকক্ষয় সবচেয়ে বেশি। আর ভারতের অন্তর্গত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নিকোবর গোষ্ঠীর দ্বীপগুলি সুমাত্রা দ্বীপের সবচেয়ে কাছে (ন্যূনতম দূরত্ব 91 কি.মি.) হওয়ায় সেখানেই বিপর্যয়ের চেহারা ভারতের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াল। এবং তার পর থেকে সেখানে থেকে থেকে ভূমিকম্প হয়েই চলেছে। ভারতের মূল ভূখণ্ডে তীব্র বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে পূর্ব-উপকূলস্থ দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল।

মাদ্রাজের নাগাপট্টিনম, কুড্ডালোর, কন্যাকুমারী, চেন্নাই ও অন্যান্য, কেরলের কোচিন ইত্যাদি। পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় এবং দূষণের প্রকোপে এবার দুর্গত মানুষদের মধ্যে মহামারীর ভয়ঙ্কর বিপদের ছায়া পড়েছে।

এমন ভয়াল বিপর্যয়ের পরে যখন পত্রিকা প্রকাশিত হতে চলেছে সেখানে প্রকাশিত রচনায় তার প্রতিফলন হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে এত তাড়াতাড়ি তা আমাদের সাধ্যের অতীত। এজন্য আমরা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

পত্রিকার এই সীমিত সাধ্য *বিওবি*-র সীমিত পাঠক গোষ্ঠীর অজানা নয়। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও গত বছরের বইমেলার পর ও এই বইমেলার আগে আর কোনো সংখ্যা বের করা সম্ভব হয় নি। এই সীমিত সাধ্যকে আরও বাড়ানো সম্ভব কি-না সে-ব্যাপরে বেশ কিছু আলোচনা প্রকাশিত হচ্ছে। আশা, যে এ-ব্যাপারে আরও মতামত ও সহায়তা পাওয়া যাবে।

তবে অন্যান্য কিছু বিষয়ের ওপরও লেখা থাকছে। সেজন্য কলেবরও একটু বৃদ্ধি পেল।

পরিচালকমণ্ডলী

প্রয়াত অজিত নারয়ণ বসুকে মনে রেখে

গত আটাশে নভেম্বর (2004), সাতাত্তর বছর বয়েসে (1927-2004) অজিত নারায়ণ বসু কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। *বিওবি*-র সাথে যুক্ত কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে কখনও কখনও তাঁর সান্নিধ্যে এসে থাকলেও পত্রিকা হিসেবে তিনি *বিওবি*-র সাথে কতটা পরিচিত ছিলেন সেটা বলা মুশ্‌কিল। কিন্তু যাঁদের উত্তরাধিকারের অনেকটাই ঘনিষ্ঠ বৃত্তের বাইরের অন্যদের কাছেও শিক্ষাপ্রদ বার্তা বহন করতে পারে তিনি ছিলেন তেমনই একজন।

পেশাগত উচ্চশিক্ষার দিক থেকে তাঁকে প্রচলিত অর্থে একজন 'অর্থনীতিবিদ' বলা চলে। সেই শিক্ষা ও পেশাদারী যোগ্যতা নিয়েই তিনি কর্মজীবনে বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-বিকাশ, নগর ও গ্রামোন্নয়ন এবং পরিকল্পনা বা যোজনা সংক্রান্ত নানা সরকারি পর্ষদ বা সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানে নীতি-নির্ধারক পদে কাজ করেছেন। কিছুদিন খড়গপুর আইআইটি-তে অধ্যাপনাও করেছেন। এইসব সূত্রেই তিনি পশ্চিমের দেশে অর্থাৎ বিদেশে গিয়ে গবেষণালব্ধ ডিগ্রিও অর্জন করেছেন। আবার তরুণ বয়েস থেকেই তিনি মতাদর্শগতভাবে 'বাম' শিবিরেরই অংশ ছিলেন। আজকের ক্ষমতাসীন 'বাম' শিবিরের অনেক ক্ষমতাধারীই তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচিতদের মধ্যে পড়েন।

কিন্তু ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থানরত যাঁরা কম বেশি তাঁকে জানতেন তাঁরা তাঁকে মনে রাখবেন এমন একজন মানুষ হিসেবে যিনি স্বীকৃত নানা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থা বা প্রাতিষ্ঠানিক 'বাম' শিবিরের অর্ন্তভুক্ত হয়েও সে-সবের গৎবাঁধা সংকীর্ণ সীমার বাইরে গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিয়ে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে অনেকখানিই সক্ষম হয়েছিলেন। সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব স্বতন্ত্র চিন্তা-ভাবনা নিয়েই। তাঁর পেশাদারী উচ্চদক্ষতা নিয়ে তিনি শিল্প ও কৃষি উৎপাদনের কাজে সরাসরি নিযুক্ত শ্রমজীবী মানুষের সাথে নিবিড় গভীর ও ধারাবাহিকভাবে নিজেকে সংশ্লিষ্ট রেখেছিলেন—একাধারে তাঁদের সুহৃদ, শিক্ষক ও ছাত্র হিসেবে; নির্বোধ আত্মম্ভরিতাপূর্ণ 'বিশেষজ্ঞ' কিম্বা ক্ষমতালোভী 'নেতা' হিসেবে নয়। এমনকী একেবারে শেষের দিকে যখন কিডনির ব্যাধির কারণে কষ্টদায়ক ডায়ালিসিসের জন্য মাঝে মাঝেই হাসপাতালে ভর্তিহতে হতো তখনও হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেই যে সেই সক্রিয় জীবনে ফিরে যেতেন সেকথা তাঁরা ঘনিষ্ঠ পরিচিতদের কাছ থেকেই জানা গেল।

প্রশিক্ষিত মন, অধীত বিদ্যা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, শিল্প ও কৃষি-ব্যবস্থার কী ধরণের পুনর্গঠনে শ্রমজীবী মানুষ ও সাধারণভাবে সমগ্র সমাজ উপকৃত হতে পারে সে-ব্যাপারে তিনি অনলসভাবে ভেবেছেন, লিখেছেন এবং সাধ্যমতো হাতেকলমে চেষ্টা করে গেছেন। *পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি* ও *রাজনীতি* নামে একটি গ্রন্থে তিনি তাঁর এই সংক্রান্ত চিন্তাকে সার্বিকভাবে উপস্থিত করেছেন। তাঁর চিন্তা ও কর্মের কোনো মূল্যায়ন করা এখানে আমাদের লক্ষ্য নয়। এখানে আমরা তাঁর নিষ্ঠাভরা প্রচেষ্টা ও তাঁর অভিমুখের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছি।

এই সূত্রেই তিনি সমধর্মী কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত বহু অ-সরকারি সংস্থার সাথেও যুক্ত থেকেছেন। এরকমই একটি সংস্থা কলকাতার 'নাগরিক মঞ্চ' আয়োজিত এক স্মরণসভায় (18 ডিসেম্বর, ভারত সভা হল্, কলকাতা) তাঁর সাথে দীর্ঘদিন ধরে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত নানা পেশা, কর্মক্ষেত্র ও মহল থেকে আগত মানুষের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ থেকে বেরিয়ে এসেছে কী গভীর নিষ্ঠা ও দরদ নিয়ে তিনি তাঁর পেশাগত শিক্ষা ও দক্ষতাকে শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। চলনে-বলনে ও অন্যদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই রোগা-পাতলা ছোটো-খাটো মানুষটি ছিলেন অনাড়ম্বর। সহজ উষ্ণ হৃদয়সম্পন্ন ব্যক্তি।

জীবনের শেষ দশকে তাঁর আচার-আচরণ ও কথাবার্তায় একটা তিক্ততার ছায়া কাছেদূরে অনেকেরই চোখে পড়েছে। তাঁর কল্যাণ প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে তাঁর পুরনো পরিচিত আজকের প্রাতিষ্ঠানিক 'বাম' শিবির ও পরবর্তীকালে পরিচিত অ-সরকারি নানা সংস্থা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার কোনোটাই যে সর্বাংশে সুখকর হয় নি সেটা তাঁর এই সব তিক্ত মুহূর্তে বেরিয়ে আসত। আমরা এই প্রবীণ, জনহিতে নিয়োজিত চিন্তাশীল ও দরদী প্রয়াত মানুষটির স্মৃতির উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

সম্পাদকমণ্ডলী

জাতীয় পরিবেশ নীতি দুহাজার চার

জাতীয় পরিবেশ নীতি (National Environmental Policy সংক্ষেপে NEP 2004 শীর্ষক একটি খসড়া দলিল ভারতের পরিবেশ ও বনমন্ত্রকের তরফে ইন্টারনেটে প্রচার করে তার ওপর মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল। 30 নভেম্বর 2004 ছিল সময়সীমা। *বিওবি*-র পক্ষ থেকে 29 নভেম্বরই ই-মেলে একটি বক্তব্য পাঠনো হয়েছে। আগ্রহী বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করে সম্মিলিত বক্তব্য পেশ করলে নিশ্চয়ই ভালো হতো। কিন্তু সময়াভাবে তা করা যায়নি। এতদঞ্চলের আরও অনেকে হয়তো নিজেদের বক্তব্য পাঠিয়েছেন। সেগুলিও আমরা জানতে আগ্রহী। আমাদের বক্তব্য নিয়েও আলোচনা-বিতর্ক চলুক, সেটা চাই। এই রচনাটি (লিখেছেন রবীন মজুমদাব) *বিওবি*-র পাঠানো বয়ানের বঙ্গানুবাদ নয়, তবে বিষয়বস্তুতে অভিন্ন।

স. ম.

বর্তমানে পৃথক পৃথক কয়েকটি দলিলে পরিবেশবিষয়ক নীতিসমূহ ছড়িয়ে আছে —যেমন জাতীয় অরণ্য নীতি (ন্যাশনাল ফরেস্ট পলিসি), 1988; জাতীয় সংরক্ষণ কর্ম-পরিকল্পনা এবং পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক নীতি ঘোষণা (ন্যাশনাল কনজারভেশন স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড পলিসি স্টেটমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট), 1992; দূষণ প্রশমণ সংক্রান্ত নীতি ঘোষণা (পলিসি স্টেটমেন্ট অন অ্যাবেটমেন্ট অফ পলিউসান), 1992 এবং জাতীয় জলনীতি (ন্যাশনাল ওয়াটার পলিসি), 2002 । NEP 2004 এগুলিকে একটি সংহত রূপ দিতে চায় এবং ইতিমধ্যে অর্জিত জ্ঞান, তথ্য ও অভিজ্ঞতার আলোয় উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে চায়। শুধু নীতি ঘোষণা নয়, NEP 2004 হবে কর্মপন্থার দিক নির্দেশও। খসড়া দলিলে ঘোষিত এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

খসড়া দলিলটিতে চালু নীতিসমূহের বেশ কিছু অপ্রতুলতা, অযথার্থতা বা অসফলতার উল্লেখ ও ইঙ্গিত করা হয়েছে। এও বলা হয়েছে যে, এই নীতিপ্রস্তাবে অনেক নতুন ও ধারাবাহিক উদ্যোগের অবতারণা করা হয়েছে। কিন্তু 38 পৃষ্ঠার খসড়া দলিলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকায় এইসব ত্রুটিও নতুনত্বের সন্ধান ও চিহ্নিতকরণ মোটেই সহজ নয়। সুবিধামতো একজায়গায় এগুলি তালিকাভুক্ত করতে পারলে দলিলটির মান উন্নত হতো বলে মনে হয়।

আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে এমন সমস্ত ত্রুটি ও নতুনত্ব নিয়ে বিশদ বক্তব্য আমরা রাখছি না, তবে এই দুটি নিরিখের ভিত্তিতেই কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এক

সাতটি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য (Objectives) চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু খুবই আশ্চর্য ও লক্ষণীয় যে টেকসই বা দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নকে (Sustainable Development, SD) জাতীয় পরিবেশ কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। অথচ বিভিন্ন সূত্রে দলিলে SD প্রসঙ্গ এসেছে। একেবারে গোড়াতেই যেমন বলা হয়েছে, ভারতের উন্নয়ন-দর্শনে SD সম্পর্কিত বিষয়গুলি ফিরে ফিরে আসে। অন্য এক জায়গায় আছে, ভারতের সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট নীতির প্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে, যেমন : শক্তির ব্যবহারে দক্ষতার উন্নতি, নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার। মিশ্র-জ্বালানি, শক্তির মূল্য নির্ধারণ, দূষণ প্রশমন, অরণ্যসৃজন, জনপরিবহণ ইত্যাদি। পরিবেশ-সম্পদের দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহার, দীর্ঘমেয়াদি কৃষি, ট্যুরিজম ইত্যাদি নিয়েও দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের জাতীয় উন্নয়ন ভাবনায় ও কর্মে সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট যদি এতটাই গুরুত্ব পেয়ে থাকে, তাহলে পরিবেশ নীতি ঘোষণার লক্ষ্য হিসেবে তাকে চিহ্নিত করাই কি যথাযথ হতো না? 1992-এর দলিলটি কিন্তু এ-ব্যাপারে অনেক বেশি স্পষ্ট ও সোচ্চার ছিল, যদিও তখন SD একটি তত্ত্বকাঠামোর বেশি কিছু ছিল না, আর এখন তা বাস্তব প্রয়োগের গভীরে প্রবেশ করেছে।

প্রস্তাবিত সাতটি লক্ষ্যের প্রথমটিতে 'ক্রিটিক্যাল' (critical) ইকোলজিক্যাল সিস্টেম ও সম্পদের সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কিভাবে কোনো বিশেষ ইকোসিস্টেমকে 'ক্রিটিক্যাল' গণ্য করা হবে তার কোনো ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি দলিলে। বস্তুত ইকোসিস্টেম মাত্রেই ক্রিটিক্যাল এবং সুরক্ষা ও সংরক্ষণ দাবি করে—এই যখন বিজ্ঞানীদের অবস্থান তখন এ ধরণের পক্ষপাতিত্ব অপরাপর ইকোসিস্টেমকে আপ-উন্নয়নের বলি হবার পথ সুগম করতে করতে পারে। পরিবেশ নীতির দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো—আন্তঃপ্রজন্ম সমতা—দরিদ্রদের জীবিকার নিরাপত্তা (Intra-Conventional Equity—Livelihood Security of the Poor)। কিন্তু শুধু দরিদ্রদের জীবিকার নিরাপত্তা বর্তমান প্রজন্মের মানুষদের সমতার সূচক নয়। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব ভারতবাসীরই সুপারিবেশে মানবিক উন্নতিবিধান কাম্য এবং তা সম্ভব করে তোলার জন্য সমাজিক লক্ষ্য হিসেবে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নকেই লক্ষ্য হিসেবে তুলে ধরা সঙ্গত হতো। দরিদ্রদের জীবিকার নিরাপত্তা মানবিক উন্নয়নের অঙ্গমাত্র এবং পরিপূরক অঙ্গগুলির বিকাশ না ঘটলে দরিদ্রদের জীবিকার নিরাপত্তা বিধান সম্ভব কি?

দুই

খসড়া পরিবেশনীতি NEP 2004-এ পনেরোটি ভিত্তিসূত্র (Principles) চিহ্নিত হয়েছে। এগুলি পরিবেশ নীতির রূপকারদের দিকনির্দেশক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা। দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নকে লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত না করা সত্ত্বেও প্রথম ভিত্তিসূত্রেই বলা হয়েছে—দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন ভাবনায় কেন্দ্রে আছে মানুষ। কিন্তু এই সূত্রকে এভাবে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব দিয়ে বসলে অনেক বিপত্তি ঘটার সম্ভাবনা। দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন ভাবনায় মানুষের কেন্দ্রীয় অবস্থানের প্রশ্নে দীর্ঘ বিতর্ক হয়েছে। পরিবেশের কেন্দ্রে মানুষের অবস্থান এই ভাবনা থেকেই জীব-প্রকৃতির প্রতি অবজ্ঞা-উপেক্ষা-উদাসীনতা ও কর্তৃত্বের মনোভাব। ইকোসিস্টেমের স্থায়িত্বের। নিরিখে, ইকোলজির বিচারে মানুষের গুরুত্ব কেন্দ্রীয় তো নয়ই এমনকী অণুজীবদেরও নীচে। অথচ আমরা মানুষরা আমাদের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে অসঙ্গতভাবে অতিসচেতন, তাকে উস্কে দিলে সবকিছুই মানুষের সেবার জন্য—এমন ভাবনা ও প্রচেষ্টা জোরদার হবে যা SD-র পরিপন্থী। SD ভাবনায় মানুষের উন্নয়ন অন্য সব জীবপ্রজাতির তথা সব ইকোসিস্টেমের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা।

শিল্প ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে পরিবেশে যে দূষণ ঘটে তার জন্য দূষককেই মূল্য দিতে হবে (Polluters pay)- নীতির প্রয়োগ ঘটেছে আমাদের বর্তমান পরিবেশ আইনকানুনে। 1992-এর পরিবেশ নীতিতেও এ-ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য খসড়া প্রস্তাবের অন্যতম ভিত্তিসূত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে—অর্থনৈতিক দক্ষতা (Economic efficiency) এবং সেই প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে যে 'দূষককে মূল্য দিতে হবে' সূত্রের প্রয়োগ আরও সুষ্ঠু ও জোরদার করা হবে। এও বলার চেষ্টা হয়েছে যে, অর্থনৈতিক দক্ষতার বিচারে আমরা পরিবেশ ও তার ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন ঠিকমতো করতে পারিনি এবং দূষককে মূল্য দেওয়ার নীতির প্রয়োগ হয়েছিল একপেশে। পরিবেশ বিধিনিষেধ অমান্য করার জন্য আমরা শুধুই ভীতি ও কর্তৃত্বপ্রদর্শনের পথ নিয়েছিলাম। মানার জন্য উৎসাহদান করিনি। এই ত্রুটি-দুর্বলতাগুলি সঠিকভাবেই চিহ্নিত হয়েছে (*বিওকি*-র পাঠকের স্মরণে পড়তে পারে একথা, "Polluters pay নীতি এখন Pay and Pollute নীতিতে পর্যবসিত হয়েছে। অক্টো-ডিসে, 1999) কিন্তু এরপরও আলোচ্য দলিলে যখন বলা হয় দূষকদের দূষণের জন্য মূল্য দেওয়া **উচিত নীতিগতভাবে**, তখন এই উদারতায় সন্দেহের ছায়া পড়তেই পারে। এবং প্রশ্ন উঠেই পড়ে, পরিবেশের সম্পদের ভোগ কি সব ভারতবাসী সমানভাবে করেন? পরিবেশের দূষণ ও ক্ষতিতে কি সব ভারতীয়ের অবদান সমান? এ দুটি প্রশ্নের উত্তর যদি না হয়, তবে পরিবেশের সুরক্ষা-সংরক্ষণে সব ভারতীয়ের দায়িত্ব অভিন্ন ও সমান হবে কি করে? আবার, প্রশ্ন যদি হয়—পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতিতে নগণ্য অবদান সত্ত্বেও দরিদ্র ভারতবাসীরাই কি সর্বাগ্রে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না? এমনকী তাদের জীবন ও জীবিকাই কি সর্বাগ্রে বিপন্ন হয় না? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর যদি হ্যাঁ হয় তবে জাতীয় পরিবেশ নীতির ভিত্তিসূত্র হিসেবে একথা স্পষ্ট করে উচ্চারণ করা উচিত যে, (ক) পরিবেশ দূষণ রোধে ও সম্পদ সংরক্ষণে সব ভারতবাসীর অভিন্ন কর্তব্য হলেও দায়ভাগ অসমান এবং (খ) পরিবেশ সম্পদের ভোগস্বত্বে সব ভারতীয়ের সমান অধিকার। বিশ্বপরিবেশের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ও বহুপক্ষীয় আলোচনা-চুক্তির আঙিনায় যদি আমাদের আচরণের ভিত্তি হয়—খসড়ায় যা স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে—যে, (ক) পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতিতে পৃথিবীর সব দেশের অবদান সমান নয় তাই তার সংশোধনের দায়দায়িত্বও অসমান এবং (খ) পরিবেশ-সম্পদের ভোগস্বত্বে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার, তবে জাতীয় ক্ষেত্রে আমরা তা মান্য করব না কেন? আর তা যদি না করি তবে লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত অন্তঃ আর আন্তঃপ্রজন্ম সমতার স্বার্থে

আমরা কিভাবে কাজ করব?

"বিকেন্দ্রীকরণ" আর একটি ভিত্তিসূত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং এটিই বর্তমান নীতি সংস্কার ভাবনার কেন্দ্রে অবস্থান করছে বলেই মনে হয়। যে সব পরিবর্তন-পরিমার্জনের সহায়ক করে তোলার জন্য এই নীতি-সংস্কার, এই প্রসঙ্গে তার কয়েকটি উল্লেখ্য—(ক) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিলম্ব ও স্তর কমানো, বিশেষত উন্নয়নপ্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে; (খ) পরিবেশ বিধিনিষেধ অমান্য করার ক্ষেত্রে নীচতলার—অফিসারদের অমান্যকারীকে অপরাধী চিহ্নিত করে মামলা করার যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তা খর্ব করা; (গ) সর্বাগ্রগণ্য জনস্বার্থে যে সব ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সংস্থান এবং জীবপ্রজাতিকে সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে না, সেরকম ক্ষেত্রে ব্যয়সার্থক (cost-effective) সংশোধন-পন্থা (offsetting measures) গ্রহণ করা (যেমন, বোধহয়, প্রাকৃতিক অরণ্য বাঁচানো না গেলে বনসৃজন করা); (ঘ) সরকারি অসরকারি অংশীদারিত্বের মডেল হিসেবে বর্জ্য-শোধন, বর্জ্য-দহন, বর্জ্য-সমাধি (landfilling), ময়লা জল পরিশোধন ইত্যাদি ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও চালানো (ঙ) কঠিন বর্জ্যের বিহিত (disposal) করার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাইরে কাজ করানো (outsourcing) ইত্যাদি। (ক) ও (খ)-এর বেলায় কেন্দ্রীকরণের ঝোঁকই স্পষ্ট, কিন্তু আসল কথা হলো, ইতিপূর্বে সরকার যেসব দায়দায়িত্ব নিজের হাতে রেখেছিল, এখন সেসব আর বহন করতে চায় না! নীতি হিসেবে বিকেন্দ্রীকরণ সর্বদা গণতন্ত্রসম্মত ও অগ্রগতির সমার্থক শোনায়, তাই সেই স্লোগানের আড়াল নিয়ে যা বাস্তবে করতে চাওয়া হচ্ছে তাতে এটাই স্পষ্ট যে, NEP 2004-এর পেছনে আছে প্রবল এক ব্যধ্যবাধকতা—দেশী বিদেশী বিনিয়োগের পথের সমস্ত কাঁটা দূর করা, পরিবেশ আইনকানুনের বিভিন্ন খাঁজে যা ইতিমধ্যেই প্রোথিত হয়ে গেছে। রাজ্যে রাজ্যে উন্নয়নের কারবারীরা জলাভূমি, বনভূমি, কৃষিভূমি, উপকূল অঞ্চল ইত্যাদির উন্নয়নের জন্য আরও অধিক ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা চেয়ে চিৎকার ও দরবার করছে—তাদের অপ-উন্নয়নের পথ কি আমরা এভাবে সুগম করে দেব? সর্বাগ্রগণ্য জনস্বার্থ (overriding public interest) বলতে কি বোঝানো হচ্ছে, কারা কিভাবে এ-ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন, দলিল সে ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিত দিচ্ছে না।

পরিবেশের ক্ষেত্রে, বিকেন্দ্রীকরণ ভিত্তিসূত্রের একটি চূড়ান্ত প্রকাশ হতে পারে ব্যক্তিনাগরিকদের প্রতি আহ্বানে—হে মহান সুনাগরিক, আপনার পরিবেশের সুরক্ষা ও সংরক্ষণের দায়িত্ব আপনার নিজের! বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চয়ই পরিহার্য নয়, কিন্তু সম্ভাব্য অপব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার ঠেকানোর উপায়ের ইঙ্গিত থাকবে না কেন পরিবেশ নীতিতে?

তিন

নীতিরূপায়ণ কেমন হচ্ছে তা পর্যালোচনার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে খসড়া দলিলে। শুরুতেই বলা হয়েছে—কোনো নীতি ততটুকুই ভালো, যতটুকু সুষ্ঠুভাবে তা রূপায়িত হয়। হক কথা। কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও বলা উচিত যে, আংশিক বা নির্বাচিতভাবে রূপায়ণ না-রূপায়ণ বা না-নীতির চেয়েও খারাপ। তাই ঘটে আসছে এতদিন।

খসড়ায় বলা হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রতিষ্ঠানে যথেষ্ট কারিগরি ক্ষমতা-দক্ষতার অভাব, নিয়মিত দেখভাল করবার মতো পরিকাঠামো এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষিত কর্মীর অভাব এবং জনসাধারণের তরফে অপ্রতুল অংশগ্রহণের কারণে পরিবেশ বিধিনিয়ম ঠিকমতো প্রয়োগ করা যায় নি। যদিও উল্লিখিত কারণগুলিকে অস্বীকার করার উপায় নেই, পরিবেশ বিধিনিয়ম মান্যতায় ঘাটতি বা বিকৃতির মূল কারণ কিন্তু এগুলি নয়। সরকারি উদাসীনতা এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবের যে কথা দলিলে প্রসঙ্গান্তরে উল্লেখ করা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট বার বার যে-ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস পেয়েছে, সেগুলি স্বীকার না করলে নীতি-সংস্কার আখেরে কোনো কাজে আসবে না। পরিবেশ বিধিনিয়ম মেনেই অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ করতে হবে বিনিয়োগকারীদের কাছে এমন কোনো বার্তা যাতে ঘূণাক্ষরেও না পৌঁছয় সেজন্য কেন্দ্রে-রাজ্যে বিভিন্ন সরকার সমান যত্নশীল।

এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে একথা জোরের সঙ্গে বলা দরকার যে, গৃহীত হবার পর পরিবেশ নীতির সুষ্ঠু ও সামগ্রিক রূপায়ণ করার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস নেওয়া হবে। বাৎসরিক পর্যালোচনা এবং দীর্ঘতর সময়ের ব্যবধানে আধুনিকীকরণ ও সংস্কারের যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে তাকে স্বাগত জানিয়েও একটি প্রশ্ন, অর্থমন্ত্রকের অধীন ক্যাবিনেট কমিটির উপর বার্ষিক পর্যালোচনার দায়িত্ব না দিয়ে এর জন্য অসরকারি জনপ্রতিনিধি ও স্বীকৃত বিশেষজ্ঞদের সামিল করে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিশেষ কমিটি গঠন করাই কি শ্রেয় হতো না?

চার

খসড়া দলিলে পরিবেশ-সচেতনতা, শিক্ষা ও তথ্যাদি প্রচারের উপরে প্রভূত জোর দেওয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে উল্লিখিত চালু

নীতি-ঘোষণাগুলিও এ ব্যাপারে যথেষ্ট সোচ্চার ছিল। সেইসব অনুসরণে স্কুল-কলেজে পরিবেশ শিক্ষার যেটুকু ব্যবস্থা করা হয়েছে তা শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে ভারী বোঝার উপরে আরও ভারই শুধু চাপিয়েছে। খসড়া প্রস্তাব অনুযায়ী যদি ভবিষ্যৎ নাগরিকদের শিক্ষার বোঝা না বাড়িয়ে পারিবেশ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় তবে তা হবে একটা কাজের কাজ। বস্তুত পরিবেশের সামগ্রিকতা সংহতি ও জীবন-নৈকট্যের বিবেচনায় শিক্ষার্থীদের বোঝা কমানোও সম্ভব। কিন্তু তার জন্য অগ্রজ, পূর্বসুরি শিক্ষকদেরই আগে প্রতীতি জন্মানো দরকার যে পরিবেশ একটি সংহত সমগ্র নবজ্ঞান, বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ছড়ানো ছেটানো টুকরো জ্ঞানের সমষ্টি নয়। বিভিন্ন বিষয় থেকে আহরণ আর বিচ্ছিন্ন শুকনো তথ্যের উদ্‌গীরণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনাগ্রহ এমনকী ঘৃণার জন্ম দেয় শুধু। পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্বের স্বার্থে এবং ভবিষ্যৎ মানব প্রজন্মের রুটি-রুজি ও মানবিক বিকাশের স্বার্থেই যে এভাবে আমরা আর চলতে দিতে পারি না, সে উপলব্ধির সময় বয়ে যায়। পরিবেশ ও উন্নয়নের মেলবন্ধনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজায় ব্যর্থ হয়ে বোঝাটা আমরা ক্রমাগতই নবীন প্রজন্মের ঘাড়ে ফেলে দিচ্ছি এটা বোধহয় জঘন্যতম দায়-এড়ানো-বাইরে-চালান (Externalization)-এর নমুনা !

পাঁচ

খসড়া দলিলে উল্লিখিতে বহু বিষয়ের মধ্যে আর দু-একটির উল্লেখ করতে হচ্ছে।

বনবাসী উপজাতিদের প্রতি গভীর ঐতিহাসিক আবিচার ঘটেছে বলে স্বীকার করে নিয়ে খসড়া দলিলের প্রস্তাবে তাদের চিরাচরিত অধিকারের আইনী স্বীকৃতি দেওয়া হবে এবং জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট (JFM)-এর ব্যাপক বিস্তৃতির (Universalization) উদ্যোগ নেওয়া হবে। ভালো কথা। কিন্তু দলিলে স্পষ্ট করে বলা হয়নি যে, বনবাসী উপজাতিদের অধিকারের আইনী স্বীকৃতি কি তাদের কোনোরকম স্বত্বাধিকার (eatitlement) স্বীকার করবে? আর JFM বলতে সাধারণত বোঝায় জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট। ফরেস্ট ও ফরেস্ট্রি শব্দ দুটি সমার্থক নয়, ফরেস্ট বলতে কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক সব ধরণের অরণ্যকে বোঝালেও, ফরেস্ট্রি সচরাচর কৃত্রিম অরণ্যকেই বোঝায়। বনবাসীদের অধিকারের স্বীকৃতি এবং JFM -এ তাদের অংশগ্রহণ কৃত্রিম অরণ্যে সীমিত করার জন্যই কি 'ফরেস্ট্রি'র ব্যবহার? বর্তমানে চালু JFM-এ বনবাসীরা অধিকারহীন কর্তব্য ঠিকমতো পালন করলে—অর্থাৎ বন-দপ্তরের অধীনে জনমজুর হিসেবে খাটলে, ডাল-পালা পাতা বা কিছু লভ্যাংশের ভাগ পেতে পারেন । এভানে কিন্তু JFM বেশিদূর এগোতে পারবে না।

জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণে জনজীববিদ্যার (Ethnobiology) মতো চিরাচরিত জ্ঞানের (Traditional knowledge) স্বীকৃতিদানের প্রস্তাব আছে খসড়া দাখিলে। কিন্তু জল সংরক্ষণ ও ব্যবহারের প্রসঙ্গে এমন কোনো কথা বলা হয়নি। তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে, জলের ক্ষেত্রে ভারতের কোনো ঐতিহ্যপরম্পরাগত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা নেই যা আজকের দিনের জলসমস্যার সমাধানে কাজে লাগতে পারে? তা তো নয়! উদাহরণ বিস্তর এবং সরকারি প্রচেষ্টার বাইরে চিরাচরিত জ্ঞান প্রজ্ঞা ও কারিগরির উপর ভিত্তি করে তো অনেকগুলি সার্থক কাজও হয়েছে এবং হচ্ছে। তবু খসড়া দলিল এ-ব্যাপারে নীরব কেন?

পরিশেষে বলা যাক, প্রাপ্ত-প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তথ্য জ্ঞানের নিরিখে অনেক পুরোধা বিজ্ঞানীর মতে অরণ্য বন্যপ্রাণী জলবিভাজিকা ইত্যাদি সুরক্ষা-সংরক্ষণে ইকোসিস্টেম-অনুসারী পন্থাই (Ecosystem approach) সর্বোত্তম। কিন্তু খসড়া NEP 2004 একানেও নীরবতা বেছে নিয়েছে।

দুহাজার পাঁচ-এর কলকাতা বইমেলায় প্রতিবারের মতো এবারেও
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী-র টেবিল থাকছে।
পাঠক-গ্রাহক-শুভানুধ্যায়ী-সহমর্মী সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ রইল।

মৃত্যুদণ্ড : চিকিৎসকের অংশগ্রহণ ও নৈতিকতা

অমিত সরকার

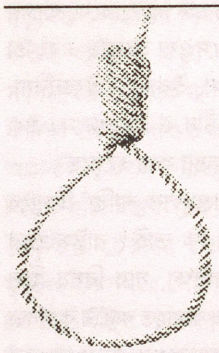

বহু প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত, শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের মতো অমানবিক প্রথা নিয়ে বিভিন্ন দেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে—সত্যিই কী টিকিয়ে রাখা প্রয়োজন নিষ্ঠুর, হীন জীবনের অধিকারের পরিপন্থী এই প্রথার? প্রশ্ন তোলা হয়েছে, মৃত্যুদণ্ড সংঘটনে চিকিৎসকের দায়িত্ব নিয়েও। কারণ মৃত্যুদণ্ডের বিবর্তনে চিকিৎসকের ভূমিকাও বারে বারে লক্ষ্য করা গেছে। এসব প্রশ্ন আরও বেশি সাধারণ্যে চলে এসেছে সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গে ধনঞ্জয় চ্যাটার্জির ফাঁসিকে ঘিরে। আর সেই প্রেক্ষিতেই মৃত্যুদণ্ডের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে 'মানবিকতা' 'নৈতিকতা' ইত্যাদি ধারণাগুলি একটু বুঝে নেওয়ার প্রয়োজন আজ জরুরি হয়ে পড়েছে।

স.ম.

প্রাক্‌কথন

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের শেষ আর্জি যখন রাষ্ট্রপতি আব্দুল কালাম প্রত্যাখান করেন তখন থেকেই বিভিন্ন গণমাধ্যমে ফাঁসির যৌক্তিকতা নিয়ে নানা মত গল্প প্রকাশিত হতে থাকে—জেলের অভ্যন্তরে ধনঞ্জয় কিংবা বাইরে তার পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের প্রাত্যহিক কার্যবিবরণী; তাদের দুঃখ হতাশা ক্ষোভ; শেষদিন পর্যন্ত অন্ধবিশ্বাস—ঈশ্বরের কৃপায় অবশ্যই মুক্তি পাবে ধনঞ্জয়, এমন আশা; তদুপরি বিভিন্ন মাধ্যমে এক ফাঁসুড়ের নিয়মিত সাক্ষাৎকার, 'সেলিব্রেটি' হয়ে যাওয়া; বিচার-ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতার পুরনো গল্প উদাহরণ; একই রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মত, দ্বিচারিতা ইত্যাদি নিয়মিত প্রকাশ পেতে থাকে। এর পাশাপাশি বিদগ্ধজনদের নানা ব্যাখায় উক্ত ঘটনা এক নতুনমাত্রা পেয়ে যায়। রীতিমতো এক থ্রিলার গল্প। আর এ-গল্পে জড়িয়ে পড়ে অফিস-কাছারি, ট্রেন বাস, ঘর-গেরস্থালি। অবশেষে 14 আগস্ট, 2004 সংগঠিত হয় স্বাধীন ভারতের পঞ্চান্নতম ফাঁসি। পরবর্তীতে ছয়জন শিশুর উক্ত ঘটনার অনুকরণে গলায় ফাঁস লাগানো, এবং মৃত্যু মিডিয়ার বাড়াবাড়ির ফলেই এমনটি ঘটেছে; শিশুমনে ফাঁসির প্রভাব, তাদের নিঃসঙ্গতা, অসহায়ত্ব মনোবিদের ব্যাখা এবং তাও প্রকাশিত হয় সেই প্রচারমাধ্যমেই—ইত্যাকার বিভিন্ন ঘটনা আলোচনা প্রশ্ন আমাদের সমাজের নানাসংকটকে প্রকটিত করছে, পণ্ডিতপ্রবরেরা এ-ব্যাপারে তাদের মতামত দিয়ে চলেছেন, এই আলোচনা চলছে এবং চলবেও।

আমাদের আলোচনা এ-নিয়ে নয়, বরং এ-সম্পর্কিত অন্য এক বিষয়ে—সামগ্রিকভাবে মৃত্যুদণ্ড তার বিভিন্ন পন্থা সারা বিশ্বের প্রেক্ষিতে এবং বিশেষভাবে এই কর্মকাণ্ডে চিকিৎসকের ভূমিকা ও নৈতিকতা প্রশ্নের।

মৃত্যুদণ্ড সারাবিশ্বে

সারাবিশ্বে আশিটি দেশে মৃত্যুদণ্ড অবলুপ্ত হয়েছে, পনেরোটি দেশে সাধারণক্ষেত্রে অবলুপ্ত হলেও বিশেষক্ষেত্রে, মূলত যুদ্ধ-অপরাধে বহাল রয়েছে। আর তেইশটি দেশে এই প্রথা আইনত থাকলেও বাস্তবে বিগত দশবছরে একজনকেও এই দণ্ড দেওয়া হয়নি। অবলুপ্ত হয়ে যাওয়া দেশগুলির মধ্যে মূলত রয়েছে ইওরোপ ও লাতিন আমেরিকার প্রায় সব দেশ ও অস্ট্রেলিয়া এবং মৃত্যুদণ্ড অবলুপ্ত করবার আন্দোলনে তারই অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। 2003 সালে মোট যে 1146 জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে তার 84 শতাংশ সংঘঠিত হয়েছে চীন, ইরান, আমেরিকা ও ভিয়েতনামে। ইরানে 108 জন, আমেরিকাতে 65 জন, ভিয়েতনামে 64 জন আর একক চীনে 489 জন। লন্ডন থেকে প্রকাশিত *The Observer*- এর এক প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, অধিকাংশ মৃত্যুদণ্ডই দেওয়া হয়েছে

রাষ্ট্রদ্রোহিতার কারণে। 1977 সাল থেকে 2004 সালের তেসরা মার্চ পর্যন্ত আমেরিকাতেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে 900 জনের আর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা ঝুলে রয়েছে 3500 জনের ওপর। আমেরিকার 50টি রাজ্যের মধ্যে 38টি রাজ্যে মৃত্যুদণ্ড আইনসিদ্ধ। দুঃখজনকভাবে 1985 সালে চারটি দেশে এই প্রথা অবলুপ্ত হলেও আবার নতুন করে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে আমাদের প্রতিবেশী দেশ নেপাল আর বাকি তিনটি হল, ফিলিপাইন, জাম্বিয়া ও পাপুয়া নিউ গিনি। আমাদের অপর এক প্রতিবেশী দেশ ভূটান সাম্প্রতিকতম সংযোজিত হয়েছে এই প্রথা অবলুপ্তি ঘটানো দেশের তালিকায়। 1997 সাল থেকে প্রতিবছর রাষ্ট্রপুঞ্জে Commission on Human Rights Resolution-এ যে সকল দেশে এখনও মৃত্যুদণ্ড রয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে মৃত্যুদণ্ড রহিত করার আবেদন জানানো হয়। আর মৃত্যুদণ্ড রদ করার আন্দোলনে নেতৃত্বে থাকা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের এ-ব্যাপারে পরিষ্কার বক্তব্য যে মৃত্যুদণ্ড নিষ্ঠুর অমানবিক হীন ও জীবনের অধিকারের পরিপন্থী। অপরাধ দমনে এর সাফল্য ও অপ্রমাণিত।

> The death penalty is the ultimately cruel, inhuman and degrading punishment. It violates the right on life. It is irrivocable and can be inflicted on the innocent. It has never been shown to deter crime more effectively than the punishment?

মৃত্যুদণ্ড রদের ব্যাপারে সাম্প্রতিককালে যে সকল আর্ন্তজাতিক, আমেরিকান ও ইওরোপীয় চুক্তি হয়েছে তা হলো :

1. The second optional protocol to the international covenant on civil and political rights.
2. The protocol to the American Convention on Human Rights to abolish the death penalty.
3. Protocol No.6 and No. 13 to the European Convention for Protection of Human Rights and Fundamental Freedom (European Convention on Human Rights).

আর্ন্তজাতিক আইন অনুযায়ী আঠারো বছরের নীচের কিশোরকে কোনোসময়ই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না। রাষ্ট্রপুঞ্জের 76টি দেশ সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, 2005 সালের মধ্যে পৃথিবী থেকে কিশোর মৃত্যুদণ্ড তুলে দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হবে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন, আইনজীবীদের সংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়ন —আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অথচ বাস্তবে, 1990 সালের পর থেকে 36 জন কিশোরকে, যাদের বয়স আঠারো বছরের নীচে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং তা দেওয়া হয়েছে আটটি দেশে—কঙ্গো, ইরান, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, সৌদি আরব, আমেরিকা, চীন ও ইয়েমেনে। এক আমেরিকাতেই 19 জন কিশোরকে হত্যা করা হয়েছে।

আমরা প্রায়শই শুনতে পাই 'দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি' হিসাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়ে থাকে। বাস্তবে কি তাই? রাষ্ট্রসংঘের 2002 সালের বিজ্ঞানসম্মত এক সমীক্ষা, যার বিষয় ছিল অন্যান্য শাস্তির চাইতে মৃত্যুদণ্ড অপরাধ কমাতে কতটা কার্যকর তার ফল অনুযায়ী আজীবন বন্দিত্ব মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে লঘুতর শাস্তি এবং খুন করার মতো অপরাধ প্রতিহত করার ক্ষমতাও তার কম, এমনটা ভাবা অসমীচিন।...

> It is not prudeut to accept the hypothesis that capital punishment deters murder to a marginally greater extent than does the threat and application of the supposedly lesser punishment of life imprisonment.

আরো এক জায়গায় রিপোর্টটি বলছে :

> The fact that statistics continue to point in the same direction in persuasive evidence that countries need not fear sudden and serious changes in the curve of crime if they reduce their reliance upon the death penalty

মৃত্যুদণ্ডের উপর আস্থা কমালে দেশে দেশে অপরাধচিত্রে তাৎক্ষণিক বিরাট প্রভাব দেখা দেবে—তথ্য-পরম্পরা নিশ্চিতভাবেই এই ভীতিকে সমর্থন করে না। এই প্রসঙ্গে কানাডার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, 1975 সালে হত্যা

অপরাধের হার ছিল প্রতি লাখে 3.05 জন: তা কমে 1980 সালে দাঁড়ায় 2.41 জন এবং পরে তা আরও কমে যায়। 2002 সালে 'মৃত্যুদণ্ড' অবলুপ্তির 26 বছর পরে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রতি লাখে 1.85 জন যা কিনা 1975 সালের তুলনার 40 শতাংশ কম।

মৃত্যুদণ্ড : পদ্ধতির বিবর্তন

দণ্ডিত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানোর পদ্ধতির বিবর্তন ঘটেছে, সংগঠকেরা হত্যাকে মানবিক করার পরীক্ষা চালিয়েছেন। যেমন ফাঁসির ক্ষেত্রে, দণ্ডিত ব্যক্তির জিভ বেরিয়ে আসে যা দৃশ্যত অমানবিক, ফলে পরিত্যাগ করা হয়; গিলোটিনে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন কাটা মস্তক কোনোসময়ই 'নান্দনিক' নয়; 'মানবিকতর' বৈদুতিক চেয়ারে হত্যা—তাতেও অসুবিধা দেখা দিল, মৃত্যুকালীন সময়ে সেই ব্যক্তির মাঁথা দিয়ে গ্যাসীয় পদার্থ নির্গত হয় যা উপস্থিত সকলকে অস্বস্তিতে ফেলে— এভাবেই ফাঁসি, গিলোটিন, গুলি করে হত্যা গ্যাসচেম্বার কিংবা বৈদ্যুতিক চেয়ার বিবর্তিত হয়ে বর্তমানে মৃত্যুদায়ী ইনজেকশন এসেছে। সারাবিশ্বে গৃহীত আধুনিকতম মৃত্যুদায়ী পদ্ধতি। কেননা বিশেষজ্ঞের মতে এই পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত, মানবিকতম।

আমাদের দেশে মৃত্যু ঘটানোর ক্ষেত্রে, এখনও ফাঁসির ওপরই নির্ভর করা হয়। প্রাচীন কালে শূলে চড়িয়ে, বেত্রাঘাতে, চাবুক মেরে কিংবা হাতির পদতলে পিষ্ট করে আসামীদের জীবন শেষ করে দেওয়া হতো। ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে 1760 সালে অপরাধীদের তোপের মুখে দাঁড় করিয়ে হত্যা করার রীতি চালু ছিল বহুদিন। পরবর্তীতে বারুদের অত্যধিক দামের কথা বিবেচনা করে ফাঁসির প্রচলন ঘটে এবং তা তখনও প্রাকশ্যেই ঘটত।

শ্রীপান্থের লেখাতে যেমন পাওয়া যায়: '1820 সন পর্যন্ত কলকতায় নিয়ম ছিল মৃতদেহ ঝুলিয়ে রাখা হবে নদীর ধারে। দর্শকরা যাতে দেখে বুঝতে পারে ইংরাজের শহরে অপরাধীর ঠাঁই নেই। 1820-র পর ফাঁসির আসামির দেহ ভাসিয়ে দেওয়া হতো নদীর জলে। সে প্রথার চল নাকি ছিল 1855 পর্যন্ত... ' অতঃপর জেলের অভ্যন্তরে ফাঁসি দেওয়ার রেওয়াজ শুরু হয়। যদিও 2003 সালের এপ্রিল মাসে আমাদের দেশের Law Commision তার প্রাসঙ্গিক নথিতে ফাঁসির অবলুপ্তি ঘটিয়ে 'মানবিক' প্রাণনাশক ইনজেকশনের পক্ষে রায় দিয়েছেন। অতএব আমাদের দেশেও প্রচলিত হতে চলেছে 'মৃত্যুদায়ী ইনজেকশন'।

মৃত্যুদণ্ডে চিকিৎসকের ভূমিকা

মৃত্যুদণ্ডের এই আলোচনায় চিকিৎসকের ভূমিকা, তার অবস্থান, নৈতিকতা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। প্রাসঙ্গিক এই কারণে, কেননা রাষ্ট্র ও তার বিচারব্যবস্থা অভিযুক্তকে দণ্ডিত করেই তার ভূমিকা পালন করে কিন্তু তা রূপায়ণের দায়িত্ব যাদের ওপর বর্তায় চিকিৎসক তাদের মধ্যে অন্যতম। মৃত্যুদণ্ড প্রাচীন হলেও তার মুখ্য ভূমিকায় চিকিৎসকের অংশগ্রহণ 1789 সাল থেকে। বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সে গণতন্ত্র ও সমতাবাদী দর্শনে বিশ্বাসীদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রাকমুহূর্তে ফরাসি দুই ডাক্তার অ্যান্টনি লুইস এবং যোশেফ ইগনেসি গিলোটিন মস্তকছেদনের জন্য যে যন্ত্র আবিষ্কার করেন তা 'গিলোটিন' নামে কুখ্যাত। এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে 1792 সাল থেকে 1977 সাল পর্যন্ত। পরবর্তীত 1981 সালে এই পদ্ধতি নিষিদ্ধ হয়। গিলোটিন, বৈদ্যুতিক চেয়ার, ফাঁসি কিংবা ইনজেক্শন যে পদ্ধতিই অবলম্বন করা হোক না কেন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র চিকিৎসককে উদ্বুদ্ধ বা নির্দেশ করে তাঁর সামাজিক দায়বোধের কথা স্মরণ করিয়ে। ডা. গিলোটিনও এই সামাজিক দায়বোধ থেকেই তৎকালীন চালু অন্যান্য পদ্ধতির চাইতে অপেক্ষাকৃত মানবিক পদ্ধতি হিসাবে এই যন্ত্র তৈরি করতে উদ্যোগী হন, অবশ্য পরবর্তীতে তিনি তার এই কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করেন। শারীর বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ডা. গিলোটিন শারীর বিজ্ঞানের যে জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছিলেন তাহলো, ধারালো কোনো অস্ত্র দিয়ে ঘাড়ের কোমল কোষকলায় আঘাত করলে তৎক্ষণাৎ গুরুমস্তিষ্কের আন্তঃচাপ অত্যধিক হ্রাস পায়, ফলে সেই ব্যক্তির একমুখিন অচেতনতা ত্বরান্বিত হয়। বৈদ্যুতিক চেয়ার—সেও এক দন্তচিকিৎসকের চিন্তাপ্রসূত। খরচের আধিক্য এবং যান্ত্রিক কিছু অসুবিধার কারণে এই পদ্ধতি শেষপর্যন্ত অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। আর আউসভিৎসের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ইহুদি হত্যার সময় শপথ স্বীকারোক্তি যিনি পাঠ করাতেন তিনিও এক ডাক্তার, নাম ডা. মেইন। তিনি আবার পেশার দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে রাষ্ট্র অনুগৃহীত হওয়ার কারণে ইহুদি নিধনের প্রবক্তা হয়েছিলেন, তা না হলে কী করে বলবেন যে মানবজাতির দেহে ইহুদিরা অপ্রয়োজনীয় ঘেয়ো উপাংশ, সেটাকে সরিয়ে রোগমুক্তি ঘটানোই আমার লক্ষ্য?

> Of course I am a doctor and I want to preserve life. And out of respect for human life I would remove a gangrenous

appendix from diseased body. The jew is the gangrenous appendix in the body of mankind

বিভিন্ন পদ্ধতির বির্বতনের পর অবশেষে 1970 সালে ইনজেকশনের মাধ্যমে মৃত্যু সংগঠিত করার পন্থা প্রবর্তন হয়। প্রবক্তা সেই একজন ডাক্তার—ডা. স্ট্যান্‌লে ডয়েকাচ্, যিনি ওক্লাহোমা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানাসথেটিস্ট। তাঁর ভাবনায় ছিল মৃত্যুদায়ী ব্যবস্থাপনা হিসাবে বারবিটিউরেট এবং শক্ত কোনো পেশী নিস্তেজক ব্যবহার করা যা বিনা অনেক বেশি মানবিক, দণ্ডিত ব্যক্তির extremely human demise- এর জন্য। এই পদ্ধতির প্রথম ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল দেওয়া হয় 1982 সালে আমেরিকার টেক্সাসে চল্লিশ বছর বয়সী চার্লস ব্রুকসের ওপর, অবশ্য তাকে দেওয়া হয়েছিল সোডিয়াম থায়োপেনটাল, পানকিউরোনিয়ম ব্রোমাইড এবং পটাশিয়াম ক্লোরাইড-এর মিশ্রণ। তারপর থেকে আমেরিকায় আজ পর্যন্ত শতকরা 97 জনকে এই পদ্ধতিতে হত্যা করা হয়। প্রসঙ্গত 1939 সালে হিটলারের 'জাতীয় প্রতিকার মৃত্যু কর্মসূচি' যা T-4 কোড নামে পরিচিত, তার মূল ব্যাপার ছিল শারীরিক এবং মানসিক অক্ষম ব্যক্তিদের হত্যা করা এবং সেই লক্ষ্যে মেডিক্যাল মডেল তৈরি করা। তার মুখ্য অধিকর্তার বক্তব্য ছিল 'The syringe belongs in the hand of a physician, আমেরিকার সরকারও যখন মৃত্যুদায়ী ইনজেকশনের মাধ্যমে দণ্ডিত ব্যক্তির হত্যায় চিকিৎসকদের অংশগ্রহণ করাতে এবং সে-ব্যাপারে শিক্ষিত করতে নির্দেশ দেয় তখন যেন সেই সুরের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। এই পদ্ধতি অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত, মানবিক, অনেকে বলে থাকেন। আমাদের দেশেও অনেকে ফাঁসির মতো আদিম পদ্ধতির অবলুপ্তি ঘটিয়ে 'মানবিকতর' আধুনিক কোনো পদ্ধতির কথা বলেন। অতএব আধুনিকতম মানবিক বলতে এই 'মৃত্যুদায়ী ইনজেকশন'। বাস্তবে কি তাই? প্রায়শই অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে ডাক্তারদের;কোনোসময় শিরা পাওয়া যায় না, সিরিঞ্জের সূঁচের মাথায় রক্ত জমাট বেঁধে অসুবিধা ঘটায়; এছাড়া অভিযুক্তের শরীরের অন্য অসুবিধা যেমন রক্তচাপ বৃদ্ধি, অতিরিক্ত মেদ ইত্যাদির বিড়ম্বনাও আছে। 1996 সালে টমি স্মিথকে মারতে সময় লেগেছিল পাক্কা 69 মিনিট। প্রথমে স্মিথের শিরা ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছিল না, তারপর ঘাড়ে সূঁচ ফুটিয়ে নল ঢোকানোর চেষ্টা করলে তাও ব্যর্থ হয়, অবশেষে অ্যানজিও ক্যাথিটার পায়ে ঢোকানো হয় এবং তার মাধ্যমে শরীরে মৃত্যুদায়ী ইনজেকশনের অনুপ্রবেশ করানো হয়। এটি একটা উদাহরণ মাত্র, এমন ঘটনা আরো আছে। গুয়াতেমালায় প্রথম প্রয়োগের ক্ষেত্রে, প্যারামেডিক্যাল ব্যক্তিরা নার্ভাস হয়ে এমন কাণ্ড ঘটায় যে মাঝপথে সব বন্ধ রেখে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে তলব করে আনতে হয়। ওষুধ প্রয়োগে মৃত্যু সংঘঠন প্রথম শুরু হয় আমেরিকায়, পরপরেই তাইওয়ান, গুয়াতেমালা, ফিলিপাইনে এই পদ্ধতির প্রচলন ঘটে। আর চীনে শুরু হয় 1997 সালে, সেখানে ডাক্তারেরা প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করে এই কর্মকাণ্ডে। 2003 সালে থাইল্যান্ডে ওষুধ প্রয়োগে মৃত্যু দেওয়ার আইন প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গেই সরকারি নির্দেশে ডাক্তারদের মধ্যে প্রশিক্ষণ কর্মশালা সংগঠিত হয়।

মৃত্যুদণ্ড অংশগ্রহণে চিকিৎসকের নৈতিকতা

আমাদের দেশ ভারতবর্ষে ফাঁসি সংঘঠিত হওয়ার তিরিশ মিনিট পর চিকিৎসককে মৃত ঘোষণা করে সার্টিফিকেট দিতে হয়। পৃথিবী জুড়ে বির্তক শুরু হয়েছে এই ধরণের মৃত্যুসংঘঠনে ডাক্তারের অংশগ্রহণ, তার পেশার নৈতিকতা নিয়ে। বলা হচ্ছে, একজন চিকিৎসক যে পেশাগতভাবে মানুষের জীবনরক্ষা করার মহান-ব্রতে অঙ্গীকার নেন, বাঁচবার ন্যূনতম সম্ভাবনা থাকলে সচেষ্ট থাকেন সেই ব্যক্তি কী করে রাষ্ট্র-বিচারব্যবস্থা দ্বারা ঘোষিত হত্যাকাণ্ডের শরিক হবেন! যে সকল দেশে মৃত্যুদণ্ড অবলুপ্ত হয়েছে সেখানে চিকিৎসকদের সংগঠন শরিক হয়েছে রাজনৈতিক মানবাধিকার আন্দোলনে। তারই প্রতিফলন ঘটেছে অ্যামেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের ঘোষণাপত্রে : একজন চিকিৎসক কোনোসময়ই মৃত্যুদণ্ড রূপায়ণে অংশগ্রহণ করবে না, যদি (এক) তা দণ্ডিত ব্যক্তির মৃত্যুর জন্য প্রত্যক্ষ দায়ী হয়;(দুই) অপর এক ব্যক্তি যে প্রত্যক্ষভাবে এই কর্মে যুক্ত, তাকে কোনওভাবে সাহায্য কিংবা তত্ত্বাবধান করে; (তিন) তা হয় এমন কোনো পদক্ষেপ যা অবধারিতভাবে এই কর্মের অংশ।

কর্তৃপক্ষের নির্দেশে চিকিৎসক কোনোসময় ট্রানকুইলাইজার, সাইকোট্রপিক বা অন্য কোনো ওষুধ দেবে না কিংবা ই.সি.জি বা কোনো পরীক্ষা করবে না যদি তা কোনোভাবে মৃত্যুসংঘটনে সাহায্য করে। অথচ আমরা দেখেছি ফাঁসির আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ধনঞ্জয়কে সুস্থ রাখবার জন্য জেলকর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট ডাক্তারেরা কতটা সচেষ্ট ছিলেন। ইনজেকশনের মাধ্যমে মৃত্যুর ক্ষেত্রে ডাক্তারের ভূমিকা আরো প্রাসঙ্গিক কেননা শরীরের কোন্ অংশে ইনজেকশন দেওয়া

হবে, কিভাবে দেওয়া হবে, যদি ধমনী পেতে অসুবিধা হয় তাহলে কি করণীয়, ওষুধের মাত্রা কী হবে, তদুপরি যন্ত্রপাতি ঠিক করা, তত্ত্বধান করা এ-সব কাজে ডাক্তারের অংশগ্রহণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। নির্দেশনামায় এটাও বলা আছে। একজন চিকিৎসক অভিযুক্তের (এক) শারীরক ও মানসিক পরীক্ষা কিংবা চিকিৎসা করতে পারে যদি তা বিচারের ক্ষেত্রে সাহায্য করে; (দুই) 'মৃত' এই মর্মে সার্টিফিকেট দিতে পারবে তখনই যখন তা অন্য কোনো ব্যক্তি বা দপ্তর দ্বারা 'মৃত' বলে ঘোষিত হবে; (তিন) মৃত্যু সংঘঠিত হওয়ার সময় উপস্থিত থাকতে পারবে নিতান্তই একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে 'non professional capacity' থেকে; (চার) কেবল মাত্র তার অনুরোধে তার উদ্বেগ, ব্যাথা কমানোর ওষুধ দিতে পারবে। চিকিৎসকের পেশার নৈতিকতার প্রশ্নে পরিষ্কার বলা আছে :

> 'When a condemned prisioner has declared incompetent to be executed, physicians should not treat the prisioner for the purpose of restoring competence unless a commutation order is issued before treatment begings.

যদি চূড়ান্ত দুর্ভোগের ফলে বন্দির মানসিক অসুস্থতা কিংবা কোনোরকম 'অসামর্থ্য' (মৃত্যুদণ্ড গ্রহণে) দেখা দেয় তবে চিকিৎসক তার 'সামর্থ্য' ফিরিয়ে আনার কোনো চিকিৎসা করবে না যাতে মৃত্যু-সংঘঠন সুবিধাজনক হয়। দণ্ডিত ব্যক্তির শরীরের কোনো অংশ মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে যা করার ব্যাপারে বলা আছে: (এক) দণ্ডাজ্ঞার পূর্বে বন্দির দানের সম্মতি থাকতে হবে;(দুই) 'মৃত' ঘোষাণার পর মৃতদেহকে চেম্বার থেকে আনার পরেই কেবলমাত্র দেহ থেকে দানের দেহাংশ তুলে নেওয়া যাবে (তিন) 'দান'কে কার্যকর করতে চিকিৎসক কোনোসময়ই 'মৃত্যু' ঘটনোর পদ্ধতির পরিবর্তনের পরামর্শ দেবে না। বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযোগ দৃঢ় হয়েছে যে, কোনোরকম দানের সম্মতি ছাড়াই নিয়মিতভাবে চীনে মৃত বন্দির দেহাংশ তুলে নেওয়া হয় এবং অসাধুচক্রের মাধ্যমে তা বাইরে বিক্রিও হয়। অবশ্য চীন সরকার এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে।

ডা. ফেবারের নেতৃত্বে এক হাজার জন আমেরিকান চিকিৎসকের ওপর এক সমীক্ষা চালানো হয়। সেখানে দশটি প্রশ্ন রাখা হয় মৃত্যুদায়ী ইনজেকশন দ্বারা মৃত্যু সংঘঠিত করায় চিকিৎসকের অংশগ্রহণের ইচ্ছার ওপর। সমীক্ষার ফল থেকে যে সিদ্ধান্তে আসা যায় তা হলো, বেশিরভাগ চিকিৎসকেরই তাঁর চিকিৎসক সত্তা, নৈতিকতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেই সাধারণ মানুষের মতোই তাঁরা এই কর্মে যুক্ত হতে চান, সামাজিক দায়িত্ব পালন করছেন এই ধারণার বশবর্তী হয়ে। তাঁদের উত্তরে স্ববিরোধিতাও বর্তমান; এও দেখা যায় যে, প্রথমের উত্তরগুলিতে অংশগ্রহণের পক্ষে সম্মতি দিলেও পরবর্তী উত্তরগুলিতে তাঁরা তাঁদের অবস্থান সম্পর্কে সন্দিহান হয়েছেন এবং নৈতিকতার টানাপোড়েনে এ-কাজ থেকে অব্যহতি পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এই সমীক্ষার ভিত্তিতে আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন মৃত্যু দেওয়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসকের অংশগ্রহণে তাদের নৈতিক অবস্থান বিষয়ে শিক্ষিত করবার উদ্দেশ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নেয়। কেননা চিকিৎসকেরা কোনোসময়ই নিম্নলিখিত কাজগুলিতে অংশগ্রহণ করবে না : Injecting lethal drugs. Inspecting or maintaining injection devices to supervising staff who perform injection. Ordering lethal drugs. Selecting intravenous sites . Placing intravenous lines . Monitoring vital sign. Pronouncing the prsioner dead. ডাক্তার ও নার্সদের বিভিন্ন সংগঠনের যৌথ বিবৃতিতে এই কথাগুলিরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। যার মূল কথা হল যে, তাঁরা পেশার মূল উদ্দেশ্য ও নৈতিক ঐতিহ্যের পরিপন্থী কোনো কাজ করবে না।

পরিকথা

প্রশ্নটা হলো অন্যখানে, যখন এদেশের ডাক্তারেরা নিজেদের আধুনিক চিকিৎসার শরিক বলে দাবি করছেন এখানকার চিকিৎসক-রোগীর সাবেকি 'paternalistic' সম্পর্ক পরিহার করে পরীক্ষা ও তথ্যনির্ভর চিকিৎসায় ঝুঁকছেন এবং চিকিৎসক-রোগীর 'informative' সম্পর্কের পক্ষে সওয়াল করছেন, তখনই এই মিশ্রব্যবস্থায় তাঁদের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যেমন ধনঞ্জয়ের ফাঁসিকে কেন্দ্র করে এত আলোচনা বিতণ্ডা হলেও আমাদের রাজ্য বা দেশের ডাক্তারদের কোনো সংগঠনের মধ্যে এই আলোচনা হয়েছে বলে খবর পাওয়া যায়নি। তাহলে উক্ত কর্মকাণ্ডে উপস্থিত দুই ডাক্তারের সমস্যা টানাপোড়েন তাঁদের পেশার ব্যক্তিগত ঝুঁকি হিসাবে চিহ্নিত হবে এবং এ সংক্রান্ত সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে তাঁদেরকেই একক বিচ্ছিন্নভাবে ভাবতে হবে। এদেশের এমন এক ঘটনায়

ইওরোপীয় ইউনিয়নকে প্রতিবাদ করে সরকারকে অনুরোধ করতে হবে অথচ পেশাগত নৈতিকতায় যাঁরা সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত তাঁরা কিংবা তাঁদের সংগঠন নীরব থাকবে। তাঁরা কী মনে রাখবেন না 'when doctors enter the death chamber, they harm not only their relationship with their own patients but the relationship of all doctors with their patients. [যখন কোনো চিকিৎসক মৃত্যু আনতে সাহায্য করেন, তখন তিনি শুধু নিজের সঙ্গে চিকিৎসাপ্রার্থীর সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ করেন না, সমস্ত চিকিৎসক-রোগীর সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ করেন।] আরেকটি কথাও প্রাসঙ্গিক তা হলো, নাৎসীরা তাদের গণহত্যায় ওষুধের চিত্রকল্পকে কাজে লাগিয়ে প্রথমদিকে জনসাধারণের সম্মতি পেলেও পরবর্তীতে তা ডাক্তারদের এবং সমগ্র জার্মান জাতিকে কুলষিত করেছিল। ঠিক তেমনই মৃত্যু সংঘঠনে ডাক্তারদের অংশগ্রহণ শুধু সেই ব্যক্তিচিকিৎসকের সমস্যা বলে চিহ্নিত না করে, সমগ্র চিকিৎসক সমাজ এবং বৃহত্তর মানবসমাজের পক্ষে অবমাননাকর, এমনটিই ভাবা উচিত।

ত থ্য সূ ত্র

1. Amnesty International death penalty Page http: //web. amnestyorg/ Pages/ death penalty. index.eng
2. Rogev Hood, *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*, Oxtord University Press, third edition, 2002.
3. শ্রীপান্থ, *মঙ্গলপাড়ের বিচার*, পুনশ্চ প্রকাশনী, 2003
4. James Welsh, 'The Death Penalty', '*The Lancet', Extreme Medicine,* Vol 362, 2003. p. S 24-25.
5. Lifton, R. G., '*Nazi Doctors*', পৃ. 16.
6. Fabev N J, Aboff B M, Weiner J. Davis EB, Bojer EG., Ubel PA., *Physicians' Willingness to Participate in the Procese of Lethal Injection for Capital Punishment,* Ann Intern Med, 2001, 135, P. 884-85.
7. Gallagher HG., *By Irust Betrayed: Patients, Physicians and the License to Kill in the Third Reich.* Arlington VA: Vdndamere Press, 1995.
8. Liffon RJ, Mitchell G., *Who Owns Death? Capital Pnnishment, the American Conscience and the End of Executions.* Harper Collins. New york, 2000.
9. *American Medical Association Opinion* 2.06 (?) *Capital Punishment.*, In code of medical ethics: Current opinions with annotations. AMA press, Chicago, 2000, পৃ. 15-19.
10. Emannel LL, Bienen LB., *Physhcian Participation in Execution: Time to Eliminate Ennymity Provisons and Protest the Practice.*, Ann Intern Med 2001: 135: 922-924.

বিধিবদ্ধ ঘোষণা

পত্রিকার নাম	:	বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রকাশনার ভাষা	:	বাংলা ও ইংরাজি
প্রকাশনার স্থান	:	P 252, লেকটাউন, ব্লক A কলকাতা 700 089
প্রকাশ কাল	:	ত্রৈমাসিক
প্রকাশকের নাম	:	রবীন মজুমদার
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	কেমিক্যাল টেকনোলজি বিভাগ 92 এ. পি. সি. রোড কলকাতা 700 009
মুদ্রকের নাম, জাতি, ঠিকানা	:	ঐ
সম্পাদকের নাম, জাতি, ঠিকানা	:	ঐ
মুদ্রাকরের নাম ও ঠিকানা	:	ইটারনেটি প্রেসের পক্ষে প্রিন্টিং পাবলিসিটি, 117 কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট কলকাতা 700 009

আমি শ্রীরবীন মজুমদার, ঘোষণা করছি যে, উপরিউক্ত বিবৃতি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর : রবীন মজুমদার

প্রকাশক, *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*

আইনসঙ্গত হত্যাকাণ্ডের (মৃত্যুদণ্ড) প্রতিবাদে রাষ্ট্রপতির কাছে চিঠি

ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি আব্দুল কালামের কাছে সাধারণভাবে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে সওয়াল করে নীচের চিঠি দুটি একজন ভারতীয় নাগরিক পাঠিয়েছিলেন। ফাঁসির জন্য অপেক্ষারত পশ্চিমবাংলার ধনঞ্জয় চ্যাটার্জি ও বিহারের চারজন কৃষক ফাঁসির হুকুম রদ করার জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করেছিলেন। তাঁদের আবেদন মঞ্জুর করার প্রার্থনা জানিয়ে প্রথম চিঠিটি লেখা হয়েছিল। ধনঞ্জয়ের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সেই আবেদন নাকচ করার পর তার প্রতিবাদে লেখা হয় দ্বিতীয় চিঠিটি। এমন অনেক চিঠিই হয়তো রাষ্ট্রপতির কাছে পৌঁছেছে।

উল্লেখযোগ্য যে, যদিও রাষ্ট্রপতির নাকচাদেশের পর তিন সপ্তাহের মধ্যে ধনঞ্জয়কে খুন করলেই চলত, এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার স্বভাববিরুদ্ধ তৎপরতা দেখিয়ে দশদিনের মাথাতেই ঐ কর্মটি সম্পন্ন করে ফেলে। 14 অগাস্ট, 2004 ভোর রাতে (4-30) ধনঞ্জয়কে কলকাতায় আলিপুর জেলে ফাঁসিতে হত্যা করা হয়। তার আগে 14 বছর ধরে ধনঞ্জয় জেল খাটছিলেন। প্রথম একবছর বাদ দিলে বাকি সময়টা ফাঁসির আসামির জন্য নির্দিষ্ট নির্জন প্রকোষ্ঠে।

পত্রিকার এই সংখ্যায় এই বিষয়ে আর একটি নিবন্ধ আছে।

স. ম.

প্রাণভিক্ষার আবেদন নাকচের আগে

মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতায় ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে একটি আবেদন

কলকাতা, বিহার ও হয়তো আরও নানা জায়গার জেলে আটক বন্দিদের মৃত্যুদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে অল্প কিছুদিন আগে একটি আবেদন ই-মেল -এর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল। নীচেরটি তারই অনুলিপি। আপনিও যদি মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে মতপোষণ করেন তবে দয়া করে নীচের আবেদন বা অন্য কোনো আবেদন এককভাবে বা যৌথভাবে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠান। এতে ঐ উদ্দেশ্যের সহায়তা হতে পারে। ই-মেল-এর মাধ্যমে যদি পাঠাতে চান তো আপনাকে নির্দিষ্ট ওয়েব-সাইট-এ (http://www. presidentofindia.nic.in/scripts/writetopresident.jsp) যেতে হবে। জুলাই 12 ,2004

—পত্রলেখক

Kalam makes up his mind after talks with several legal experts, including attorney-general Milon Banerji. The state must give Dhananjoy 21 days' notice before execution

ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি সমীপেষু

বিষয় : দয়া করে মৃত্যুদণ্ডাদেশ রদ করুন

সবিনয় নিবেদন,

মৃত্যুদণ্ডের সম্পূর্ণভাবে বিরোধী একজন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে আমার সমস্ত আন্তরিকতা নিয়ে আমি আপনার কাছে মিনতি জানাচ্ছি যে, কলকাতার ধনঞ্জয় চ্যাটার্জি, বিহারের চারজন কৃষক এবং অন্য আর যাদের অন্তিম আবেদন আপনার সামনে রয়েছে তাদের সবারই মৃত্যুদণ্ডাদেশ আপনি দয়া করে রদ করুন এবং এভাবে আমাদের বিধি বিধানের তালিকা থেকে মৃত্যুদণ্ড বিধির বিলোপ সাধনের পথ প্রশস্ত করুন। এই বিধি বদলা নেওয়ার মানসিকতা থেকে জাত বিচারধারার প্রতীক, যা সভ্যদেশের দাবিদার আমাদের জাতির পক্ষে এক কলঙ্কস্বরূপ। আমার দিক থেকে বলতে পারি, দলিল হিসেবে যদি তার কোনো আইনীমূল্য থাকে তো, এই মর্মে

আমি এক লিখিত ইচ্ছাপত্র রেখে যেতে প্রস্তুত যে, আমাকে যদি কখনও নিষ্ঠুরতম উপায়েও হত্যা করা হয় তবুও হত্যাকারীকে যেন মৃত্যুদণ্ড না দেওয়া হয়।

যেখানে ব্যক্তির অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত সেখানেও অপরাধের "জঘন্য চরিত্র" অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেবার অজুহাত হিসেবে কাজ করতে পারে না। কারণ, তার অর্থ হচ্ছে চূড়ান্তভাবে অনৈতিক বদ্‌লা নেবার বিচারধারার সহজ প্রলোভনের কাছে একটি সভ্যসমাজ নতিস্বীকার করছে। এক বিখ্যাত উক্তিতে সঠিকভাবেই বলা হয়েছিল যে, "চোখের বদলে চোখ" এমন এক সমাজে নিয়ে যাবে যেখানে সকলেই অন্ধ। "প্রাণের বদলে প্রাণ" একইরকমভাবে এমন এক সমাজে নিয়ে যাবে যেখানে সবাই মৃত। তাছাড়া এর আরও অর্থ হলো এই যে, কার্যত আমরা এমন এক প্রয়োগ বিধি অনুমোদন করছি যেখানে একজন ব্যক্তিকে (জহ্লাদ-ফাঁসুড়ে) প্ররোচিত বা আমন্ত্রণ করা হচ্ছে যাতে সে, তার বা তার নিকটজনের ক্ষতি করেনি, এমন একজনের (দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত) প্রাণনাশ করে এবং তা করে সুপরিকল্পিতভাবে ও ঠাণ্ডামাথায়— আবেগের বশবর্তী হয়ে নয়। এরকম কাজ আত্ম-অবমাননাকর ও আত্মিক অর্থে নিজেকে ধ্বংস করার সামিল। আশ্চর্যের কিছু নেই যে, এমন কাজের দায়িত্ব নিতে একমাত্র তাঁরাই রাজি হন, যারা আমাদের সমাজের সবচেয়ে বঞ্চিত ও অবমানিত অংশ থেকে আসেন। নিছক ক্ষুন্নিবৃত্তির চেয়ে একটু বেশি রোজগারের বা বাকি সমাজের সামনে নিজ-সত্তাকে জোরের সাথে প্রতিষ্ঠিত করার অন্য কোনো বিকল্প পথ যাদের কাছে খোলা নেই। সেই সমাজ সম্পূর্ণ ভুল কারণে হঠাৎ তখন তার প্রতি মনোযোগী হয়ে ওঠে।

AGAINST DEATH SENTENCE — AN APPEAL TO THE PRESIDENT OF INDIA

To
The President of India

Sub : Please Stop the Execution

Sir,

As an India Citizen totally opposed to Death Penalty, I appeal with all the sincerity at my command to you to rescind the death sentence on Dhanonjay Chatterjee of Calcutta, on four peasants in Bihar and on any other person whose last petition may be lying before you, thus paving the way for ultimate abolition of this provision from our statute book. This provision, symbolizing the princple of retributive justic, is a blot on our nation with its claim of being civilized. On my part, I would be ready to leave a written testament that nobody should be put to death under court order even if I am murdered in cruelest manner, had such a document had any legal validity.

Even when the guilt of a person is beyond doubt, the "heinousness" of the crime committed is no excuse for a civil society to yield to the easy temptation of the most immoral principle of retributive justice. Eye for an Eye will lead to

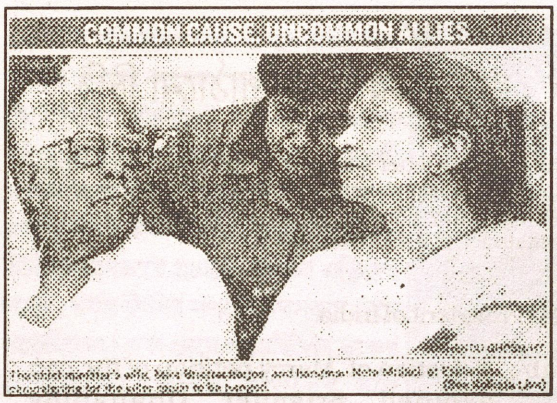

কিন্তু মানুষের গড়া কোনো বিচারমঞ্চই নির্ভুলতার দাবি করতে পারে না। নির্ভুলতার একমাত্র দাবিদার ঈশ্বর, তাও কেবল বিশ্বাসীর চোখেই। সংখ্যায় যত কমই হোক এরকম উদাহরণ রয়েছে যেখানে পরবর্তীকালে পুনর্বিচার হয়েছে এবং বিচার শেষে দেখা গেছে যে, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি নির্দোষ ছিল। এরকম একটি ঘটনাই যে-কোনো বিশেষ মৃত্যুদণ্ড খারিজ করার এবং সাধারণভাবে মৃত্যুদণ্ডের বিধানকে বাতিল করার যথেষ্ট ভিত্তি বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ, মৃত্যু একবার ঘটে গেলে যে তাকে আর ফেরানো যায় না এবং মানুষের জীবনের মূল্য যে পরিসংখ্যানে মাপা যায় না এতো একটা অতীব সরল সত্য।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির তরফ থেকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ রদ করার বিপক্ষে যে সুপারিশ করা হচ্ছে তার পেছনে সবচেয়ে ভালো যে কারণ থাকতে পারে তাহলো সংকীর্ণ দৃষ্টিসীমা ও ভাবনাহীন কোনো সাময়িক সুবিধা। দুনিয়াজুড়ে সব রঙের পেশাদারী রাজনীতিবিদ্‌দের সেটা একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। আর সবচেয়ে খারাপ কারণ যা কাজ করে থাকতে পারে সে সব না বলাই ভালো। আত্মস্বার্থের সেবাদাস এইসব "জনপ্রতিনিধিদের" মতামত দয়া করে অগ্রাহ্য করুন।

আবারও একবার আমি মিনতি জানাচ্ছি যে, যাঁরা যাঁরা আপনার কাছে দণ্ডাদেশ মকুব করার আবেদন জানিয়েছেন তাঁদের সবারই প্রাণদণ্ডাদেশ দয়া করে খারিজ করে দিন।

জুলাই 8, 2004

সুভাষচন্দ্র গাঙ্গুলী
বি-22/8, করুণাময়ী হাউসিং এস্টেট,
সল্ট লেক কলকাতা 700 091
ই-মেল ঠিকানা: subhasganguly@rediffmail.com
ফোন : (033) 2359 0297

a society of the blind as was famously and rightly said. So will a Life for a life to a society of the dead. Besides, it amounts to giving sanction to the practice of inducing and/or inviting a human being (the executioner-the hangman) to the self-degrading and spiritually self-destructive act of killing another human being (the condemned), who has not done any harm to the former or to any one near and dear to him, not in a fit of passion, but in a pre-meditated cold blooded manner. No surprise that taker for such a job comes only from the most deprived and humiliated section of our society for whom this is the only way left to earn above subsistence and/or to assert his own identity before the rest of the society, which suddenly pays a lot of attention to the person for wrong reason.

But no human tribunal can claim to be infallible, which is the sole preserve of the God in the eyes of believers. Howevee few in number, there were instances, when the condemned person was found to be not guilty in later re-opening of a trial. A single such instance is ground enough for annulment of any particular death sentence and ultimate abolition of it. For, it is a truism that death is irreversible and worth of human life cannot be measured in statistical term.

Recommendation from Home Ministry and the respective state Govt. against annulment is dictated by narrow vision and mindless expediency at the best, which are the hallmark of professional politician of all hues world over and by what it can be at the worst be better left unsaid. Please ignore the opinion of these self-serving "representatives" of the perple.

Once again I appeal to you to rescind the death sentence of all those who have prayed to you for clemency.

With regards,

Your sincerely

July 8.2004

Subhas Chandra Ganguly
B-22/8, Karunamoyee Housing Estate,
Salt Lake, Kolkata 700 091
e-mail address : subhasganguly@rediffmail.com
Phone : (033) 23590297,

প্রাণভিক্ষার আবেদন নাকচের প্রতিবাদ : রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো চিঠি

কলকাতার জেলে আটক মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ধনঞ্জয় চ্যাটার্জির প্রাণভিক্ষার আবেদন ভারতের রাষ্ট্রপতি আবদুল কালাম নাকচ করে (5 আগস্ট, 2004) দেওয়ার পরে নীচের চিঠিটি তাকে রাষ্ট্রপতির ওয়েব সাইট-এর মাধ্যমে ই-মেল যোগে পাঠানো হয় 6 আগস্ট, 2004-এ।

ভারতের রাষ্ট্রপতি সমীপেষু

বিষয়: মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত পশ্চিমবঙ্গের বন্দি ধনঞ্জয় চ্যাটার্জির প্রাণভিক্ষার আবেদন খারিজ করে দেওয়া

মহাশয়,

তাহলে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ব্যক্তি (আমিও ঘটনাচক্রে তাদের একজন) ও সংস্থার সুস্থ আবেদন/পরামর্শ উপেক্ষা করে আপনি শেষপর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ধনঞ্জয় চ্যাটার্জির প্রাণভিক্ষার আবেদন খারিজ করে দিলেন; সেই ধনঞ্জয় চ্যাটার্জি যিনি নির্জন কারাগারে চৌদ্দো বছর ধরে মৃত্যুর সারিতে অপেক্ষা করছিলেন। অন্যকথায়, অপরাধের শিকার পরিবারটির প্রতি সহানুভূতির নামে রক্তপিপাসায় অধীর কিছু উন্মত্ত জনতার দাবি শুনে চলাই আপনার বেশি পছন্দ হলো, বেশি পছন্দ হলো ফাঁসুড়ে বেচারার অনুকম্পাযোগ্য নীতিবাক্য শুনে চলা। এবং অবশ্যই সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে এবং নিশ্চিতভাবে শুনলেন কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়স্তরের পেশাদার রাজনীতিওয়ালাদের কথা, যারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের মাধ্যমে আপনার সাথে কথা বলছিল ও আপনার ওপর বিপুল চাপ সৃষ্টি করছিল।

ব্যক্তিহত্যা বা ধর্ষণ এবং গণহত্যা বা গণধর্ষণের (হেফাজতে হত্যা ও ধর্ষণসহ) হিড়িক এখন পশ্চিমবঙ্গে নিতান্তই মামুলি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মৃত্যুদণ্ড এসবের কোনো নিবারক নয়। সত্যিকারের অপরাধীদের দ্রুত খুঁজে বার করে শাস্তির ব্যবস্থা করলে সেটা কিছু পরিমাণে নিবারকের ভূমিকা নিতে পারত। কিন্তু রাজ্যর ক্ষমতাশীল রাজনীতিবিদ্‌রা সেই কাজ করতে একেবারেই ব্যর্থ ও অনিচ্ছুক (যখন তাদের নিজেদের অনুচররা এতে জড়িত থাকে)। তাদের এই ব্যর্থতা ও অনিচ্ছাকে ঢাকার জন্যই তারা এমন ভাব করছে যে যেন তাদের নীতিবোধ একেবারে দারুণ চোট খেয়েছে। এবং সেটা করছে এমন এক বন্দির জীবনের মূল্যে যে, পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের

The following letter was sent to the President of India after he rejected (August 5,2004) the clemency sppeal of Dhananjoy Chatterjee, a death row prisoner in Kolkata for last fourteen years.

To

The President of India

Sub : Rejection of Mercy petition of the con demned prisoner Dhananjoy Chatterjee of West Bengal

Sir,

So, ignoring the saner appeal/counsel from individuals (I happen to be one of these people) and organizations, home and abroad, you ultimately rejected the clemency petition of Dhananjoy Chatterjee of Kolkata, who for 14 years has been waiting in death row. In other words, you preferred to listen to the insane demand of the hysteric mob bent on a blood lust in the name of sympathy for the victim's family, to the pitiable moralizing sermon (both getting extensive media coverage) of the hangman, the poor fellow, and most importantly as well as decisively of course to the voice of the professional politicians in power both at the center and at the state speaking through the Home Ministry and putting enormous pressure on you.

For the politicians in power in West Bengal it was a question of covering up their utter failure and sometimes unwillingness (when their own cadres are involved) to bring to book (which, and not the death sentence, could act as a genuine deterrence) the culprits involved in the spate of individul and mass murder and rape (including custodial rape and murder) which have become a routine affair by appearing morally outraged at the cost of a prisoner who comes from an extremely poor family from rural hinterland

এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান ও যার রাজনৈতিক বা অন্য কোনো বড় দাদা নেই। ভাবখানা এই যে, "শান্তির মরুদ্যান" পশ্চিমবঙ্গে এরকম ঘটনা একটা ব্যতিক্রম মাত্র। এমনকী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী (যাঁকে এর আগে প্রকাশ্য সভায় কখনও বলতে দেখা যায়নি এবং যিনি সাধারণভাবে প্রচারের আলো এড়িয়েই চলেন) পর্যন্ত ফাঁসির সপক্ষে পথসভায় নেমে পড়েছিলেন। এবং নেমে পড়েছিলেন মঞ্চের নেপথ্যে অপেক্ষারত ফাঁসুড়ের সঙ্গে একযোগে। এমনটা আগে কখনও দেখা যায়নি। অবশ্য প্রায় তিন দশক আগে যখন বর্তমান বিরোধীরা ক্ষমতায় ছিল তখনও পরিস্থিতি একই রকম ছিল— শুধু ফাঁসুড়ে ও মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রীর যৌথ পথসভা ছাড়া। কিন্তু সে অন্য কথা। রাজ্যের প্রধান ক্ষমতাশীল দলের ওপর অসহায়ভাবে নির্ভরশীল কেন্দ্রের প্রধান ক্ষমতাশীল দলকে তো তাদের কথা শুনে চলতেই হবে।

এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, আপনি রাজনীতিওয়ালাদের এই দঙ্গলের (আমি শুধু পশ্চিমবঙ্গের কথাই বলছি না) চাপ এড়িয়ে যেতে পারলেন না। (এরাই সেই রাজনীতিওয়ালা গত নির্বাচন কমিশনার* যাদের একেবারে সঠিকভাষায় বর্ণনা করেছিলেন এবং যে বিশেষণের বিরুদ্ধে দল ও মত নির্বিশেষে সব রাজনীতিওয়ালারাই একেবারে রে রে করে তেড়ে এসেছিল।) নইলে একথা বিশ্বাস করা শক্ত যে, সাধারণভাবে মৃত্যুদণ্ড বিধানেরই বিরুদ্ধে সরল কিন্তু অকাট্য যেসব যুক্তি এসেছে তা বোঝার ক্ষমতা আপনার নেই। আরও মানবিক সমাজ ব্যবস্থার জন্য দুনিয়া জুড়ে সংগ্রাম করছেন এমন সমস্ত স্বাধীনচেতা ও যোগ্য আইন বিশেষজ্ঞরা সবাই এইসব যুক্তির সপক্ষে রায় দিয়েছেন। অভিজ্ঞ ও সম্মানীয় আইনজীবী সোলি সোরাবজি সাম্প্রতিককালে এক টিভি অনুষ্ঠানে এর কয়েকটির পুনরাবৃত্তি করেছেন। আপনার স্মৃতিকে সাহায্য করার জন্য সেইসব যুক্তি আর একবার সংক্ষেপে উল্লেখ করছি :

মৃত্যুদণ্ডবিধি হলো প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার মানসিকতা থেকে জাত বিচার ধারার প্রতীক, যা এক বর্বর অতীতের

* গত নির্বাচন কমিশনার শ্রী লিঙ্গোধ সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে ভারতের পেশাদার রাজনীতিবিদদের একবার সমাজ দেহে 'ক্যান্সার' এর সাথে তুলনা করেছিলেন।

having no big brother, political or otherwise, as if this was a very exceptional case in the "oasis of peace" that West Bengal is. Even the present Chief Minister's wife (who had never spoken earlier from any public platform and generally shuns limelight) came out in a an unprecedented road show jointly with the hangman,waiting in the wings, in support of execution ! The story was same (except this incident of C.M.-hangman joint roadshow) of course when the current opposition(s) was in power about three decades ago but that is another matter. The current major ruling party at the center, being abjectly dependent on the ruling party in the state, is of course had to listen to the latter.

It is most unfortunate that you could not get around the pressure of this (I do not mean only the politicians of W.B.) bunch of politicians who were depicted in very appropriate terms by the last Election Commissioner,* against which politicians cutting across party lines were up in arms. Otherwise, it is difficult to believe that you were incapable to apprcciate the very simple but irrefutable arguments against the very

* The last Election Commissioner Mr. Lyngodh, in a press statement during his tenure once compared the professional politicians in India with 'cancer' on the body-politic.

অবশেষ মাত্র এবং সে কারণেই আধুনিক সভ্য সমাজে অচল— তা সে অপরাধ যতই "জঘন্য" বা "বিরলের চেয়েও বিরল" হোক না কেন; মানুষের গড়া সব বিচারমঞ্চই ভুল করতে পারে, অথচ মৃত্যু একবার ঘটে গেলে তাকে আর ফেরানো যায় না। এক ব্যক্তিকে (মৃত্যু দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত) ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করার মতো আত্ম-অবমাননাকর ও আত্মবিনাশী কাজে অন্য আর একজন মানুষকে (জল্লাদ-ফাঁসুড়ে) প্ররোচিত করা বা আমন্ত্রণ করার রীতির প্রতি রাষ্ট্রীয় অনুমোদন মূলগতভাবেই অনৈতিক [আমাদের মতো দেশে এই কাজে এগিয়ে আসেন একমাত্র সেইসব জনগোষ্ঠীর (দলিত) মানুষরাই যাঁরা সবচেয়ে বঞ্চিত ও অবমানিত এবং যাঁদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলা হয়, যাঁদের কাছে নিছক ক্ষুণ্নিবৃত্তির চেয়ে একটু বেশি রোজগারের বা নিজসত্তাকে জনসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করার এটাই সহজতম বা কখনও কখনও একমাত্র পথ। এই বাস্তবতা দ্বিগুণ জোরের সঙ্গে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, এই রীতি কী রকম কদর্য এবং কী গ্লানিময় এঁদের জীবন];মৃত্যুদণ্ড বিধানের প্রবক্তাদের দাবির বিপরীতে সমস্ত নিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা দেখিয়ে দিচ্ছে যে, এই বিধান অপরাধের নিবারক হিসেবে কাজ করতে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ! ভারতবর্ষের মতো দেশে বিশাল খরচসাপেক্ষ আইনী আত্মরক্ষার ক্ষমতা যাঁদের নেই প্রধানত সেই দরিদ্ররাই যে এই ধাঁচের ন্যায়বিচারের কোপে পড়ে তা মৃত্যুর সারিতে অপেক্ষারত বন্দিদের মধ্যে সমীক্ষা চালালেই ধরা পড়বে।

সংবাদমাধ্যম অনুযায়ী নিহত কিশোরীটির শরীরে "কতগুলো কাটার চিহ্ন" দেখা গেছে, সেটাই নাকি ছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অন্যতম যুক্তি। কিন্তু নিজস্ব কারণেই যে নীতির সপক্ষে কোনো সওয়াল চলে না তার হয়ে এটা যে কোনো অতিরিক্ত সওয়াল হিসেবে গণ্য হতে পরে না তা ওপরের বক্তব্যের আলোতে স্পষ্ট।

আপনি যে অল্পবয়স্কদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের ভবিষ্যৎ চলার পথ সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে থাকেন, সে খবর সংবাদমাধ্যমে প্রায়ই পাওয়া যায়। বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবি যে, এরকম আদানপ্রদানের সময় তাদের কেউ যদি জানতে চায় যে, পক্ষ অবলম্বনের অনুপযুক্ত কোনোকিছুর পক্ষ অবলম্বন করার চাপ ক্ষমতাশীল মহল থেকে এলে কী করে তার মোকাবিলা তাদের কর্মজীবনে তারা করবে, তবে কী করে আপনি

provision of Death Sentence, attested to by all the indepenednt legal luminaries fighting for a more humane order world over. Recently the respceted senior lawyer Soli Sorabjee repeated some of those arguments in a TV programme. To refresh your memory these arguments, in short, are:

> the principle of retributive justice, represented by Capital Punishment is a relic of a barbaric past unacceptable in a modern civil society, no matter how "heinous" or of "rarest of the rare" nature the crime is; fallibility of all human tribunal as contrasted to the irreversibility of death; essentially immoral character of the social sanction of the practice of inducing/inviting one person (the executioner, the hangman) to self degrading and spiritually self-destructive task of killing another person (the condemned) [in a society like ours takers come only from the most deprived, humiliated and ostracized communities (*Dalits*) for whom this becomes the easiest or sometimes the only way to earn above subsistence level and to assert his identity, thus doubly emphasizing the essentially vile character of this practice and the sordid condition of their life]; contrary to claims of the votaries of this provisions, utter failure of death sentence to act as deterrence, as attested by all independent scientific survey; in a country like India it is the poor, not having the means of costly legal defense who really are at the receiving end of such justice as will be evident from any objective survey of the death row prisoners.

So in the light of the above, the "number of cuts" on the body of the victim (Home ministry's arguments as reported in press) does not provide any additional defense for what is intrinsically indefensible.

Press often reports of you meeting and ad-

তার উত্তর দেবেন। আমরা প্রাপ্তবয়স্করা তো ভালো করেই জানি এমন পরিস্থিতি অশ্রুতপূর্ব কিছু নয়। মাননীয় মহাশয়, এমন কী হতে পারে যে, আপনার "ডানা"-তে আর "আগুন"* নেই এবং বোধহয় ভিজে গেছে— চুপ্‌সে গিয়ে এলিয়ে পড়েছে।

এটা দেখে গভীর দুঃখবোধ হচ্ছে যে, আমাদের আইনের বই থেকে মৃত্যুদণ্ড বিধান বিলোপের পথ প্রশস্ত করার ক্ষেত্রে অগ্রদূতের ভূমিকা নেবার এক বিরল ঐতিহাসিক সুযোগ আপনি হারালেন। অথচ নিজের মনোমতো সিদ্ধান্ত নেবার যে অত্যল্প গুটিকয়েক প্রকৃত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি-পদের অধিকারীকে দেওয়া হয়েছে তারই একটিকে ব্যবহার করে এই ভূমিকা আপনি পালন করতে পারতেন। যতদূর অবধি কোনো দেশ মৃত্যুদণ্ডের বিধান বিলোপ করেছে অন্তত ততদূর অবধি মানবিকতাবোধকে তারা আমাদের রাষ্ট্রের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। সেই সারিতে জায়গা করে নিতে হলে সামন্ততান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক অতীতের এই মানবতাবিরোধী অবশেষকে আমাদের অতিক্রম করতেই হবে।

অনেক মানবিক অধিকার সংগঠন ও তার সঙ্গে সংযুক্ত আইনজীবীরা এখনও আশা ছাড়েন নি এবং আপনার নাকচ আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে যাবার পরিকল্পনা করছেন। সংবাদপত্র অনুযায়ী তাঁদের আবেদনের ভিত্তি হবে নাকি আপনার আদেশের তথাকথিত "খামখেয়ালি" চরিত্র। আমি একান্ত মনেই কামনা ও আশা করি তাঁরা সফল হোন। কিন্তু হবেনই যে, সে-ব্যাপারে নিশ্চিত বোধ করছি না। যদি তাঁরা সফল না হন এবং ফলে বন্দির প্রাণনাশ করা হয়, তবে এমন একজন মানুষের প্রাণনাশের দায় সরাসরিভাবে আপনারই উপর বর্তাবে, যাকে শুধু কলমের একটি খোঁচায় আপনি বাঁচতে পারতেন কিন্তু বাঁচলেন না। এবং এরজন্য কোনো মূল্যও আপনাকে দিতে হতো না— অবশ্য উল্লেখের অনুপযুক্ত এমন কিছু মূল্য ছাড়া, যা আপনার ক্ষেত্রে সত্যি হতে পারে বলে আমি মনে করি না। ভাবি যে শেষঘণ্টা যখন বাজবে (আপনার দীর্ঘজীবন কামনা করি)— যা আমাদের সবার বেলাতেই একদিন বাজবে— তখন এমন দায়ের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে আপনি নিজের সঙ্গে কতটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন?

ইতিমধ্যে খবরের কাগজের পাতা ফাঁসুড়ের ফাঁস তৈরির (আক্ষরিক অর্থে) প্রস্তুতি সহ (এ-পর্যন্ত চৌদ্দোটি গর্দান

* রাষ্ট্রপতি কালামের এক প্রকাশিত আত্মজীবনী'র নাম *Wings of Fire,* যার বাংলা অর্থ : আগুনের ডানা।

vising the young on their future course of life. I wonder how you will answer, in case you are asked during such interaction, as to how to face a situation if ever they are pressurized to defend the indefensible by powers that be during their professional career, not an unheard of situation as we all adults know. Is it possible Sir, that your "wings" are no longer "on fire" * and are possibly wet—wet and drooping?

It is extremely sad to note that you have lost a historical opportunity to use one of the very few genuinely discretionary powers granted to the incumbent to the post of the President to act as a harbinger of abolition of the provision of Death Penalty from our statute book, an inhuman relic of our feudal and colonial past, which we must outgrow to claim the membership in the comity of nations who value human values more than apparently our state do in as much as they have at least done away with that provision.

Many civil rights bodies and associated lawyers have not lost the hope and are again plainning to go to Supreme Court against your rejection. According to press reports, one of the grounds they may base their appeal on is supposedly "arbitrary" character of this rejection. I earnestly hope and wish that they succeed but am not very sure that they will. In case they do not and the prisoner is put to death, with direct responsibility of death of another human being, whom you could save just by the stroke of a pen without any real cost (except some unmentionables, which I do not believe can be true in your case) to yourself, but you did not, how comfortable you will feel with yourself, I wonder, when the bell tolls (I wish you a long life) as it will for all of us some day.

Meanwhile, press is full of lurid details of the impending execution, complete with the re-

* Name of an autobiographical book by President Kalam is *Wings of Fire.*

নেওয়ার কৃতিত্বের দাবি সে নিজেই করেছে) আসন্ন আইনী হত্যাকাণ্ডের বীভৎস খুটিনাটিতে ভর্তি হয়ে উঠছে;আগতপ্রায় হত্যাকে নিয়ে যেন এক উৎসবের আমেজ তৈরি হয়েছে। আপনার নাকচ-আদেশের ফলে প্রতিহিংসার আওয়াজ এমনভাবে বাঁধনছাড়া হয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে যে, সেটা যেন প্রকাশ্য ফাঁসিতে লট্‌কানোকেই স্বাগত জানাচ্ছে। আর নয়ই বা কেন? কারণ মৃত্যুদণ্ড যদি সত্যিই ভবিষ্যৎ অপরাধের নিবারক হয় তবে প্রকাশ্যে ঝোলালেই সেটা আরও বেশি কাজের হবে। আশা করা যায় যে, এতে সম্ভাব্য কুকর্মকারীদের শিরদাঁড়া বেয়ে আতঙ্কের হিমশীতল স্রোত বয়ে যাবে। কাগজের খবর থেকে মনে হচ্ছে, অপরাধের শিকার কিশোরীটির সেইসব প্রতিবেশীদের কাছ থেকে আপনি অভিনন্দন বাণী পাবেন, যারা তাদের নিজেদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ীই ওই অপরাধের ঘটনার পর অনেকদিন ধরে ওই পরিবারের ধারে-কাছেও ঘেঁসে নি —এমনই তাদের নিঃস্বার্থ সহানুভূতির দৌড়, যা এখন তারা ঢাক পিটিয়ে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। এমনকী শিশুদের পর্যন্ত খবরের কাগজের পাতা জুড়ে প্রচলিত দু-আঙুলের বিজয় সংকেত দেখাতে উশ্‌কে দেওয়া হয়েছে।

এই চিঠি-টা লেখার তেমন কোনো অর্থ হয় না। অর্থ এটুকুই যে, আসন্ন ঠাণ্ডা মাথায় হত্যার কথা ভেবে যে গভীর যন্ত্রণা বোধ করছি, তার কথা এমন একজন সহ-নাগরিককে জানাচ্ছি যিনি ইচ্ছে করলেই এই বর্বর ও কদর্য ঘটনাকে রুখে দিতে পারতেন। রাষ্ট্রের নানা ক্ষমতার আসনে যারা বসে আছে তাদের ঘিরে যেরকম আবহাওয়ার কথা শোনা যায়, তাতে আমার এই কথা আপনার কাছে আদৌ পৌঁছাবে কি-না সে বিষয়েও আমি নিশ্চিত নই।

গভীর বেদনায় ও নমস্কার সহ—

অগাস্ট 6, 2004

সুভাষ চন্দ্র গাঙ্গুলী
বি-22/8 করুণাময়ী হাউসিং এস্টেট,
সল্ট লেক , কলকাতা 700 091
ই-মেল ঠিকানা : subhasganguly@rediffmail.com

port of preparation of hangman's (with 24 necks to his own credit sofar, as he proudly claims) noose—literally so. Impression is almost one of celebration of anticipated death. Vengeful sound that has been unleashed all around by your rejection will almost welcome Public Execution. And why not? After all if death penalty is a deterrence it will be more so if publicly done, hopefully sending a chill down the spine of the potential mischief-maker. From press reports it appears you are to receive congratulatory messages from the former neighbours of the victim family, who according to their own admission did no go near the victim's family till long after the incident so sincere and self-less was their sympathy which they are now making a show of. Even children are being incited-to this vengeful spirit showing the customary victory sign flashed on the page of newspaper.

There is not much point in writing this letter of course, except to communicate the sense of deep anguish at the impending cold-blooded slaughter of a human being to a fellow citizen who was in a position to prevent this whole sordid business. I am not even sure that this message will reach you at all, given the popular impression about the nature of atmosphere that supposedly surrounds the dignitaries of state in India

In deep anguish and with regards—

6 August,2004

Subhas Chandra Ganguly
B-22/8, Karunamoyee Housing Estate
Salt Lake, Kolkata 700091
e-mail : subhasganguly@rediffmail.com

পত্রলেখকের সংযোজন

নিহত ধনঞ্জয়ের মামলা-সংক্রান্ত আরও কিছু দরকারি তথ্য

1. কলকাতার এক বহুতল বাড়ির একটি ফ্লাটের বাসিন্দা এক ব্যবসায়ী ধনী গুজরাতি পরিবারের 19 বছর বয়স্ক স্কুলে পাঠরত কন্যা হেতাল পারেখ 1990 সালের 5 মার্চ নিজেদের ফ্ল্যাটেই খুন হয়। সেই সময় ধনঞ্জয় ছিল ওই বাড়ির সিকিউরিটি গার্ডদের অর্থাৎ দারোয়ানদের এক জন। হেতালকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগেই ধনঞ্জয়ের মৃত্যুদণ্ড হয়।

2. ধনঞ্জয়ের বাড়ি বাঁকুড়ার কুলডিহা গ্রামে। বাবা-মা-দাদা-স্ত্রীসহ তাদের দরিদ্র পরিবার চৌদ্দোবছর ধরে ধনঞ্জয়কে বাঁচানোর জন্য মামলা চালাতে গিয়ে জমি-বাড়ি বেচে সর্বস্বান্ত হয়ে এখন সহৃদয় প্রতিবেশীদের খয়রাতির উপর বেঁচে আছে।
3. ধনঞ্জয়ের বিরুদ্ধে এর আগে এই ধরণের বা অন্য কোনো ধরণের অপরাধের কোনো অভিযোগ নেই। সে কোনো ধরণের অপরাধী গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক 'দাদা'-দের সমর্থক গোষ্ঠীর সদস্য ছিল না। তাঁর ফাঁসির হুকুম রদ করার আবেদন জানিয়ে কুলডিহা গ্রামের সাধারণ গ্রামবাসীরা ধনঞ্জয়ের বাবা-মাকে নিয়ে কলকাতার রাজভবনের সামনে কয়েকদিন ধরে ধর্না অবস্থান করেন।
4. ধনঞ্জয়ের বিরুদ্ধে দেওয়া রায়েই স্পষ্টভাবে স্বীকার করা হয়েছে ধনঞ্জয়ের বিরুদ্ধে সরাসরি (direct) কোনো সাক্ষ্য বা প্রমাণ নেই। সব প্রমাণই অপ্রত্যক্ষ বা পারিপার্শ্বিক (circumstantial), দায়রা আদালতে পুলিশের পক্ষের সাক্ষীদের একজনকেও ধনঞ্জয়ের পক্ষের উকিল জেরা (cross-examination) করেন নি। সুপ্রিম কোর্টের প্রথম যে রায়ে মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রাখা হয় তাতে এর বিশেষ উল্লেখ রয়েছে। এইরকম জেরা না করার অর্থ হল ধনঞ্জয়ের পক্ষের উকিল কার্যত পুলিশ পক্ষের সাক্ষীদের সব কথাই সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। অভিযুক্তের পক্ষের উকিলের কাজ যেখানে অপর পক্ষের সাক্ষ্য ও প্রমাণের ভ্রান্তি বা অসত্য প্রমাণ করার চেষ্টা করা সেখানে ধনঞ্জয়ের পক্ষের উকিলের এই আচরণ খুবই রহস্যজনক। ধর্ষিতা হেতালের অন্তর্বাসে যে শুক্রাণু পাওয়া গিয়েছিল তার সাথে ধনঞ্জয়ের শুক্রাণু মেলানো (matching) হয় নি। ধর্ষণের অপরাধে এটি একটি প্রাথমিক প্রমাণ। অথচ এই প্রমাণাভাব নিয়ে ধনঞ্জয়ের পক্ষের উকিল একটি প্রশ্ন ও তোলেন নি। অন্য দিকে অপ্রত্যক্ষ সাক্ষীদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সাক্ষী সেই লিফ্‌টম্যান পুলিশের কাছে দেওয়া তার আগের এজাহার আদালতে অস্বীকার করেছে। মূল বয়ান অনুযায়ী সেই নাকি ঘটনার আগে ধনঞ্জয়কে লিফটে করে ধর্ষিতা ও নিহত হেতালের ফ্ল্যাটের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছিল। ধনঞ্জয় বা তার পরিবারের যে পরিচয় উপরে দেওয়া হয়েছে তাতে টাকা দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে কোনো সাক্ষীকে বশীভূত করার ক্ষমতা তাদের ছিল না।
5 হেতালের পরিবার হেতালের খুন হবার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতার পাট চুকিয়ে মুম্বাইয়ে চলে যায়। কলকাতায় যখন মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর স্ত্রী, হেতালের স্কুলের খ্রিস্টভক্ত মহিলা প্রিন্সিপাল ও ফাঁসুড়ে স্বয়ং এবং জনতার একাংশ পথসভা করে ও খবরের কাগজের মাধ্যমে ধনঞ্জয়কে খুন করার দাবি জানাচ্ছিলেন তখনও এবং ফাঁসির পরও (যখন এইসব অপাপবিদ্ধরা ধনঞ্জয়কে হত্যায় সন্তোষ প্রকাশ করছিলেন) হেতালের পরিবারের কেউ কোনোরকম মুখ খোলা তো দূরের কথা গণমাধ্যমের কোনো প্রতিনিধির সাথে দেখা পর্যন্ত করেন নি। মুম্বাইএর ফ্ল্যাটের দ্বাররক্ষীরা ঐ পরিবারের নির্দেশ অনুযায়ী গণমাধ্যমের লোকজনদের ফিরিয়ে দিয়েছে। ধনী ও ক্ষমতাশালী আসল অপরাধীরা হেতালের পরিবারের ইচ্ছের বিরুদ্ধে নিজেদের অপরাধ চাপা দেবার সফল ষড়যন্ত্র চালায় নি তো?

ফাঁসি হওয়ার বছরখানেক বা তার চেয়ে সামান্য কমবেশি সময় আগে কলকাতার অ-বাঙালি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের একাংশ পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাশীল প্রধান দলের নেতাদের এক প্রকাশ্যসভায় সম্বর্ধনা জানায়। সেখানে কাস্তে-হাতুড়ির থার্মোকল দিয়ে তৈরি এক প্রতিরূপও উপস্থিত করা হয়েছিল! হঠাৎ 'সর্বহারার' প্রতিনিধিদের প্রতি ঝানু ব্যবসায়ীদের এত মরমী হয়ে ওঠার সাথে এই নিতান্ত অ-রাজনৈতিক ব্যাপারে ঐ দলের রথী-মহারথীদের এত উৎসাহের কোনো সম্পর্ক নেই তো?

6. ধনঞ্জয় যেরকম অবিচলিত ও শান্তভাবে ফাঁসির মঞ্চে ওঠেন ও ফাঁসুড়ে সহ উপস্থিত সমস্ত পুলিশ ও জেল আধিকারিকদের মঙ্গল কামনা করে জানান যে, তিনি 'নির্দোষ'' এবং তাঁকে ''খুন'' করা হচ্ছে—সেটা কোনো সাধারণ ''অপরাধী''র ক্ষেত্রে দেখা যায় না, একথা ফাঁসুড়ে নিজেই স্বীকার করেছেন।

এই তথ্যগুলি থেকে যুক্তিসঙ্গতভাবেই এই সন্দেহ আসে যে, ধনঞ্জয় সত্যিই অপরাধী ছিলেন কিনা। না কী বিত্তবান ও ক্ষমতাশালী কোনো বিশেষ সম্প্রদায় থেকে আগত আসল অপরাধীকে আড়াল করার জন্য একজন অসহায় সম্বলহীন ব্যক্তিকে বলির পাঁঠা বানানো হলো, যার সাথে শাসকদলও তাদের বমনোদ্রেককারী নিজস্ব কারণে পূর্ণ সহযোগিতা করল। উপরের চিঠি দুটিতে এসব তথ্যের ইঙ্গিতটুকু শুধু আছে। সেখানে প্রধানত জোর দেওয়া হয়েছে মৃত্যু দণ্ড-বিধি মাত্রেরই অনৈতিক ও মানবতা বিরোধী চরিত্রের উপর।

সু. গা.

চিকিৎসার লোকায়তিক ধারা—কুশ পা চিকিৎসা

বলাই

বহুদিন ধরে চাচাকে বলে আসছিলাম, মহিমার পায়ের চিকিৎসাটা করিয়ে নিন। পরে বয়স বেড়ে গেলে পা শক্ত হয়ে যাবে, অসুবিধা হতে পারে। বলেছিলাম মহিমার বাবাকেও। ডাক্তার এক-আধবার দেখিয়েওছিল। কল্যাণীর জহরলাল হাসপাতাল থেকে বলেছিল অপারেশন করতে হবে। করায় নি।

মহিমা চাচার নাতনি। বয়স সাড়ে-চার বছর। জন্মগতভাবে একটা পায়ের চেটো ভাঁজ— 'সে সময় যখন ও হাঁটতে শেখেনি চাপ দিলে ভাঁজটা খুলে পা সোজা হয়ে যেত—ছেড়ে দিলে ফের ভাঁজ হয়ে যেত।' এই পা-কে চালু বাংলায় বলে কুশ পা—পায়ের চেটো কোশ করা। এই পা নিয়েই মহিমা দৌড়ে বেড়ায়। খেলে বেড়ায়।

হঠাৎ একদিন চাচা বলল, এক কবিরাজ এসে মহিমার পা ঠিক করে দিয়ে গেছে। এর প্রায় মাসখানেক বাদে একদিন গেলাম মহিমার পা দেখতে। পায়ের পাতা ফেলে হাঁটছে এখন, যদিও পাতাটা সামান্য বেঁকে আছে তখনও। এরপর দু-এক সপ্তাহ বাদে বাদে গেছি দেখতে, হাঁটার জড়তা ক্রমশ কমছে ধীরে ধীরে হাঁটাটা স্বাভাবিক হচ্ছে।

লোকায়ত জ্ঞান ও প্রতিষ্ঠানিক বিজ্ঞানের বিরোধ বহু বহু যুগের। তথ্য-যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া বিজ্ঞান কোনো ধারণাকে স্বীকার করে না। আর তাই অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত কিছু কিছু লোকায়ত জ্ঞানের সঙ্গেও কখনও কখনও বিজ্ঞানের বিরোধ বাধে। কারণ একথা সত্যি যে, পরম্পরাগত জ্ঞান বহু ক্ষেত্রেই কোনো সংঘটন-প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরের তথ্য সহ সঠিক স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয় না। তাতে তার শেষ ফলাফল যাই হোক। বিজ্ঞান সেকথা মানতে রাজি নয়। সে-চায় সংঘটন-প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরের সম্পূর্ণ তথ্যের, চায় তাকে পূর্ণভাবে বুঝতে। কিন্তু এই বিরোধের কি প্রয়োজন আছে।

এই প্রবন্ধে যে-অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে তা সেরকমই এক বিতর্কের সুত্রপাত বলা যায়। সুতরাং আলোচনার দরজা খোলাই রইল।

স.ম.

কবিরাজের চিকিৎসা পদ্ধতি

এরপরেই এলাকার একের পর এক কুশ পায়ের রোগী কবিরাজের কাছে আসতে থাকে। সপ্তাহে একদিন কবিরাজ আসেন এলাকায়। একদিন গেলাম কীভাবে তিনি চিকিৎসা করেন দেখতে। রোগীকে একটা টুলের উপর বসালেন। কুশ পা-টি রাখা হলো একটা থালার উপরে। এক গ্লাস জল নিয়ে মন্ত্রপাঠ করতে করতে দু-একবার রোগীর গায়ে ফুঁ দিলেন, গ্লাসের গায়ে হাত বোলালেন দু-একবার। এরপর হাঁটুর নীচ থেকে সেই জল ঢেলে ধীরে ধীরে ধুয়ে দিলেন পুরো পা, পায়ের পাতা, আঙুল অবধি। ধোয়ার সময় ধীরে ধীরে পা-টায় হাত বোলালেন, পায়ের পাতা আঙুলগুলোকে আলগাভাবে একটু টেনে দিলেন। এরপর পায়ের পাতা যতটা সোজা করে ফেলা সম্ভব ততটা সোজা করে থালার উপর রাখলেন। একটা লাল রঙ বের করে লাগিয়ে দিলেন সেই জায়গাটার উপর, এতদিন যার উপর ভর দিয়ে ছেলেটি হাঁটত। পায়ের চেটোর উপরিতলের সেই অংশটা অনেকের ক্ষেত্রেই আধখানা টেনিস বল আয়তনের। জিনিসটা বেশ শক্ত, উপরের চামড়াটা সাধারণ লোকের গোড়ালির চামড়ার মতোই পুরু, শক্ত। এবার থেকে নিয়ম এই পায়ের উপরে ভর দিয়েই প্রধানত হাঁটতে হবে—অর্থাৎ এই পা প্রথমে ফেলে তার উপর ভর দিয়ে পেছনের পা এগিয়ে আনতে হবে। তারপর আবার এই পা সামনে এগিয়ে দিতে হবে। বাবু হয়ে বসা চলবে না। একটা ছোট টুলের উপর বসতে হবে যাতে পায়ের পাতা ফের ভাঁজ না হয়ে যায়। আর পায়ের মাপের একটা তক্তা কেটে রাতে শোবার সময় শক্ত করে কাপড়ের পাড় দিয়ে পায়ের চেটোর তলায় বেঁধে নিতে হবে। আবার এত শক্ত করে বাঁধা যাবে না যাতে রক্ত চলাচল বন্ধ

হয়ে যায়। এটা করার কারণ ঘুমের মধ্যে যাতে পা ভাঁজ না হয়। সপ্তাহ দেড়-দুই বাড়ির বাইরে যেতে নিষেধ করেন, না হলে নিয়ম মানতে পারবে না—তাড়াহুড়োর মধ্যে ফের চেটো ভাঁজ করে পা ফেলতে পারে। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় একটি বন কালো জিরে, এক চিমটে কালো জিরে, এক চিমটে মেথি বেটে মলম করে পায়ের আবের (অর্থাৎ এতদিন যার ওপর ভর দিয়ে হাঁটত) ওপর লাগাতে হবে। সকালে শক্ত হয়ে সেঁটে থাকা মলমকে ধুয়ে ফেলে ফের সেই লাল রঙ লাগাতে হবে আবের ওপর। চিকিৎসার পরে প্রথমদিকে দেখতাম কুশ পা অনেকটা সামনে ফেলে হাঁটতে হয়। হাঁটায় আগের সাবলীলতা থাকে না। আগে এই পা নিয়ে হাঁটা খেলা দৌড়নো সাইকেল চালানো, মায় গাছে ওঠা অবধি সবই চলত। প্রথম কদিন হাঁটতে গেলে ব্যথাও হয়। চিকিৎসার পরে প্রথম দেড়-দু-সপ্তাহ রোগীর বাবা মায়ের প্রায়ই মনে হয়, আগেই ভাল ছিল, এখনই বরং অসুবিধা হচ্ছে। ধীরে ধীরে হাঁটাটা সাবলীল হয়, তাদের আশঙ্কা কেটে যায়। ক্রমশ পা আরো কাছে ফেলে হাঁটে, এবং সেই আবটা যার উপর ভর দিয়ে হাঁটত ক্রমশ নরম হতে হতে, ছোট হতে হতে মিলিয়ে যায়। চিকিৎসার অঙ্গ হিসেবে কবিরাজ পুরনো ঘিয়ের মলম দেন; সেটা গরম সেঁকের সাথে পায়ে মালিশ করতে হয়। কেউ পায়ের চেটো চেপে ধরবে শক্ত করে সেই অবস্থায় একশোবার উঠ-বোস করতে হবে গোছের ব্যায়ামও দেন। প্রথমদিকে জুতো পায়ে দেওয়াও বারণ।

জুলাই মাসের প্রথম থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি অবধি আটজনকে দেখেছি যাদের চিকিৎসা করেছেন কবিরাজ। এদের চারজনকে দেখেছি চিকিৎসার আগেও। বাকিদের কাউকে দেখেছি চিকিৎসার তিনদিন পরে, কাউকে সাতদিন পরে। এরপর থেকে প্রতি দু-এক সপ্তাহ বাদে বাদে। প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই দেখেছি ক্রমশ সেরে ওঠা। যে-সব রোগীকে আমি দেখেছি তাদের কারো বয়স নয় মাস, কারো সতেরো বছর। তবে কবিরাজ বলেন, হাঁটতে না-শিখলে অর্থাৎ চারবছরের নীচের বয়সীদের চিকিৎসা করা মুশকিল কারণ তারা নিয়ম মানে না। অপরদিকে পঁচিশের বেশি বয়সীদেরও চিকিৎসা করা মুশকিল কারণ তাদের শরীর শক্ত হয়ে যায়। তবে অনেক সময় রোগী এবং বাড়ির লোকের আগ্রহের আতিশয্যে এঁদেরও চিকিৎসা করেন। মাঝে মাঝে ফলও পান। কবিরাজ সময় নেন তিন মাস। এর মধ্যে পা পুরোটা সেরে যায় এমন না। যেমন কুশ পা-টি সরু থাকে অন্য পায়ের তুলনায়, পায়ের পাতাটা অন্য পায়ের তুলনায় ছোট দেখায় তখনও। কারো কারো ক্ষেত্রে তিন মাস বাদেও পায়ের চেটোর বাঁকা ভাব দেখেছি। কবিরাজের কথা, যত সময় যাবে এই অসুবিধাগুলো কেটে গিয়ে ক্রমশ পা পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

কয়েকজন কুশ পা রোগী

প্রথমেই বলে রাখা যাক, যেসব রোগী আমি দেখেছি তারা অধিকাংশই অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের, দিন আনি দিন খাই অর্থনৈতিক অবস্থা—কারো কারো ছোট ব্যবসা আছে।

রিঙ্কা দুর্লভদের অবস্থা ভাল না। বাবা থাকে না, মা লোকের বাড়ি কাজ করে। পাড়ার লোকে অনুরোধ করল বিনে পয়সায় করে দিতে—কবিরাজও একরকম রাজি হয়ে গেলেন। তার অবশ্য অন্য উদ্দেশ্য ছিল। 'একে সারিয়ে দিতে পারলে এই-ই অন্য রোগী টেনে আনবে।' অতঃপর রিঙ্কাদের বাড়িই হলো কবিরাজের সাপ্তাহিত ঠেক। এখানেই আশপাশের গ্রাম এবং এই গ্রামের রোগীরা আসে চিকিৎসা করাতে। রিঙ্কার বয়স বারো বছর। বছরখানেক আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশুবিকাশ ও সমাজ কল্যাণ দপ্তর (প্রতিবন্ধিত্ব বিভাগ) তাকে পঞ্চাশ শতাংশ প্রতিবন্ধী (Orthopedically handicapped) বলে প্রমাণ-পত্র (Certificate) দিয়েছে, যার মেয়াদ 2013 সাল অব্দি। ছোটবেলায় রিঙ্কাকে বিশেষ জুতো পরানো হয়েছিল, সারে নি। তবে মা যত্ন করে রেখে দিয়েছেন জুতোখানা। আর কোনো চিকিৎসা অবশ্য করানো হয় নি। বর্তমান কবিরাজি চিকিৎসার তিন-চার মাস পরে রিঙ্কা এখন অনেক স্বাভাবিকভাবে হাঁটছে।

শিমুরালির সুমিত দত্তকে অবশ্য জন্মের মাসখানেকের মধ্যেই পায়ে প্লাস্টার করে দেওয়া হয়েছিল জহরলাল নেহরু হাসপাতাল থেকে। একবার নয়, দু-বার। অসুখ করে বলে খুলে ফেলতে হয়। আর কোনো চেষ্টা করা হয় নি। সুমিতের বয়স সাত বছর।

কানু সরকার,বয়স সতেরো বছর। বাংলাদেশে থাকতে ছোট-বেলায় স্থানীয় এক মুচি চিকিৎসা করেছিলেন বিশেষ জুতো বানিয়ে দিয়ে। একটা পা সেরে যায়। অন্য পা-টা আর সারানো হয় নি। অন্য কোনো চিকিৎসাও করানো হয়নি।

লক্ষ্মণ ও ভরত দুই ভাই। বয়স যথাক্রমে বারো বছর ও ছয় বছর। লক্ষ্মণের দুই পা-ই কুশ পা, ভরতের এক পা। মার কথায় 'বুগলি হুগলি'[বনহুগলি]-তে বলেছিল অপারেশন করতে হবে। অপারেশন অবশ্য বিনে পয়সাতেই হতো কিন্তু 'অপারেশন' নামেই এরা ভয় পেয়ে গেলেন। আর যান নি।

অন্য চিকিৎসাও করানো হয় নি। এদেরও চিকিৎসা করছেন কবিরাজ।

কবিরাজের কথা অনুযায়ী বহু রোগী তার কাছে এসেছে যাদের পা প্লাস্টার করা হয়েছিল—পায়ে ঘা হয়ে গেছে। প্রথমে ঘা সারিয়ে পরে তিনি এদের পায়ের চিকিৎসা করেছেন। এমন রোগীও এসেছেন কবিরাজের কাছে যাদের অপারেশন করা হয়েছে কিন্তু পা ঠিক হয় নি। এদের ক্ষেত্রে কবিরাজের বক্তব্য, 'পায়ের শিরা কেটে দিলে আমি আর কিছু করতে পারি না।' এক্ষেত্রে বলে রাখা যাক কবিরাজের প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত, এবং স্নায়ু-শিরা-ধমনী-পেশী-লিগামেন্ট-টেন্ডন এত জটিলতা তিনি জানেন না। বলে রাখা ভাল, কবিরাজ এবং যে পরিমণ্ডল থেকে তাঁর রোগীরা আসে সেখানে মানুষ 'শিরা' শব্দকে ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করেন।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি চিকিৎসা করেছেন কিন্তু সারে নি এমন রোগী আছে? বললেন, নিয়ম না মানলে সারবে না। জিজ্ঞাসা করলাম, নিয়মও মানল, বয়সও পঁচিশের মধ্যে আছে অথচ সারল না এমন হয়? জানালেন, 'হয়—যাদের পায়ের হাড় বেড়ে যায় তাদের কিছু করা যায় না। এমন হয় শতকরা দু-এক জনের।'

ইতিমধ্যেই শুনেছিলাম কেমনভাবে চিকিৎসা করেন কবিরাজ—একদিন দেখতে গেলাম কুশ পায়ের চিকিৎসা। ইতিমধ্যেই রিঙ্কার চিকিৎসা করানো হয়েছে এক সপ্তাহ হলো। লক্ষ্মণ-ভরত একই পাড়ায় থাকে রিঙ্কাদের সঙ্গে। তাদের বাবার প্রবল দ্বিধা চিকিৎসা করাবেন কি না। উলটে আরো খারাপ হবে না তো। প্রায় ঘণ্টা তিনেক কথাবার্তা চলার পর রাজি হলেন। চারপাশে মুলিবাঁশের বেড়া এবং টালির চালের অনেকগুলি ঘরের মাঝে আধকাঠা মাপের লম্বাটে উঠোনে মাদুর বিছানো হলো। চারপাশে না-হলেও কুড়ি-তিরিশ জন লোক ভিড় করে রয়েছে, ফলে কবিরাজকে প্রায় দেখা যায় না। এরকম পরিবেশেই তিনি জলপড়া দিয়ে চিকিৎসার প্রাথমিক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্বটি সারলেন।

খরচ নিয়ে বিস্তর দরাদরি চলে। যাদের পয়সা নেই তাদের কাছ থেকে কম, আর থাকলে বেশি পয়সা নিয়ে চিকিৎসা করেন। আমি তাঁকে এক একটি পায়ের জন্য দেড় থেকে তিন হাজার টাকা অব্দি চাইতে শুনেছি। দরাদরি করে সেটা অবশ্য প্রায়ই কমে যায়। তিনি জানালেন, অনেক সময় বিনেপয়সায়, আর কম নিলে সাত-আটশত টাকাও কখনও কখনও নেন। আবার কখনও কখনও রোগীর বাড়ির লোক খুশি হয়ে দশ হাজার টাকাও দিয়ে দিয়েছে।

অনেকেই অবিশ্বাস করতে পারে ভেবে মুভি ক্যামেরায় চিকিৎসার এবং চিকিৎসার আগে ও পরে দু-এক সপ্তাহ অন্তর কুশ পায়ের রোগীদের পায়ের এবং হাঁটাচলার ছবি তুলেছি। ফিজিক্যাল মেডিসিনের এক ডাক্তারকে এই ছবি দেখাতে তিনি বললেন, 'সারছে এটা বোঝা যাচ্ছে'। এ-প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, তিন ধরণের রোগী হয় কুশ পায়ের ক্ষেত্রে। এক ধরণের রোগী সেরে ওঠে কেবলমাত্র মালিশ-ম্যাসেজের ফলেই, বিশেষত যারা হাঁটতে শেখেনি। দ্বিতীয়রকম রোগী যাদের প্লাস্টার করতে হয়। পরে সপ্তাহে সপ্তাহে একই প্লাস্টারকে সামান্য বদলে বদলে দিলে পা ক্রমশ সেরে ওঠে। তৃতীয়রকমের ক্ষেত্রে শল্য চিকিৎসা না করলে চলে না। তিনি জানালেন, বনহুগলিতে প্রতিদিন এরকম তিন-চার জনের শল্য চিকিৎসা করা হয়। অনুমান করা হয়, অ্যালুমিনিয়াম পাত্রে রান্না-খাওয়া করার জন্য শরীরে অত্যধিক অ্যালুমিনিয়াম ঢুকে এই সমস্যা হতে পারে। প্রসঙ্গত বলা যায়, গ্রামের লোক অনেকে বলে থাকে, গর্ভাবস্থায় গ্রহণ হলে মা যদি উলটো-পালটাভাবে বসে তবে বাচ্চার কুশ পা হয়। কবিরাজের কথা, গর্ভসঞ্চারের সময় তিথি না মানলে এ রোগ হতে পারে। যাই হোক, যারা হাঁটতে শেখেনি তাদের ক্ষেত্রে অবশ্য কবিরাজও মালিশ-ম্যাসেজের মাধ্যমে চিকিৎসা করেন কিন্তু শল্য চিকিৎসার প্রয়োজন তিনি স্বীকার করেন না।

যখন মুভি ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলতে যাই, কবিরাজ ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন, "টিভিতে দেবেন না। ক-বছর আগে ই টিভিতে দিয়েছিল, তখন কল্যাণীর ডাক্তাররা বলেছিল, 'ওকে পুলিশে দেওয়া উচিত।' কিসের থেকে কী হবে, গলিতে গলিতে ঘুরে দু-পয়সা করে খাচ্ছি তা আমার বন্ধ হয়ে যাবে। আসলে এর মধ্যিও বিজ্ঞান আছে, ডাক্তাররা ধরতি পারছেন না।" ঘটনাচক্রে যে কজন অ-বিশেষজ্ঞ (যারা এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নন) ডাক্তারকে এই সমস্যার কথা বলেছি। তারা হয় জুতো পরানো নতুবা অপারেশনের কথা বলেছেন। এর চিকিৎসা বিষয়ে সম্যক ধারণা আছে এমন দেখি নি। অবশ্য এর আগে অব্দি যখনই কবিরাজকে চিকিৎসা-পদ্ধতি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছি তিনি দৈবী শক্তির কথাই বলেছেন।

কীভাবে সারছে

লক্ষ্মণ-ভরতের মা বলছিলেন, হাঁসখালির বাজারে এক বৃদ্ধ ওদের দেখে বলেছিলেন, তাঁরও দুই পা-ই লক্ষ্মণের মতোই ছিল। তিনি ভেবেছিলেন, 'সবাই ভালভাবে হাঁটতে পারে আমি

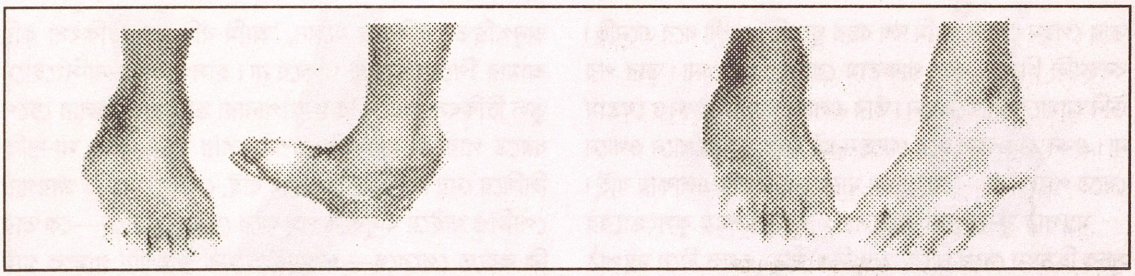

দুটি ছবিই লক্ষ্মণের দুই পা-এর —একই দিনে একই সময়ে তোলা। লক্ষ্মণ এর দুই পা-ই কুশ পা। এই ছবি তোলার সময় অবধি বাঁ পায়ের চিকিৎসা হয় নি। ডান দিকের ছবিতে বাঁ পা যেভাবে রয়েছে দুটি পা-ই সেরকম ছিল। সেভাবেই হাটাচলা করত । চিকিৎসা শুরু হয় বারোই জুলাই দুহাজার চার তারিখে। তিন মাস পরে ডান পা-টি এই অবস্থায় এসেছে। কুশ পা ভাঁজ খুলে ছড়িয়ে দিলে যে অবস্থা হয় তা দেখা যাচ্ছে বাঁ দিকের ছবিতে বাঁ পায়ে। চিকিৎসার আগে ডান পা-ও এরকম ছিল। *ছবি : লেখক*

কেন পারব না'—তিনি নিজেই নিজের পা-কে সোজা করার চেষ্টা করেন, তেল মালিশ করেন—আস্তে আস্তে তার পা ঠিক হয়ে যায়। এক বন্ধুর বাবা বলেছিলেন, হাঁটতে শেখেনি এমন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মানুষ নিজেরাই মালিশ-টালিশ করে সারাতো এমন দেখেছেন। মনে হয় খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অনুমানের ওপর পুরো চিকিৎসাটা দাঁড়িয়ে আছে—যে অনুমান সমৃদ্ধ পারম্পরিক এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়। অনুমানটি হলো **'পা আসলে ঠিকই আছে'** 'হাড়গোড় তাদের সংযোগ স্থান সবই ঠিক আছে, কেবলমাত্র পেশী, স্নায়ু, রক্তবাহী নালি-লিগামেন্ট-টেন্ডন ইত্যাদি বেমোড়ে থাকার জন্য জট পাকিয়ে আছে, বিশেষত দুই হাড়ের সংযোগস্থানে—হয়তো হাড় একটু বেঁকেও গেছে দু-একটি জায়গায়—পা সোজাভাবে ফেলার চেষ্টা করলে সেই ব্যায়ামে বা সেই চাপে এই জট ক্রমশ খুলে যাবে—হাড়ে সামান্য বাঁকাভাব থাকলে সোজা হবে। ক্রমশ পায়ের চেটো স্বাভাবিক হবে।' সে-জন্যই 'হাড় বেড়ে' গেলে এই চিকিৎসায় সারে না। সে জন্যই 'শিরা' কেটে দিলে কবিরাজ কিছু করতে পারেন না। পায়ের মাপের যে তক্তাটি প্রথমে কেটে নেওয়া হয় রাতে পায়ে বাঁধার জন্য, দেখা যায় ক্রমশ পা তার থেকে বড় হয়ে যাচ্ছে। কুশ পায়ের উপর চাপ কম দিত বলে সম্ভবত পা-টি অন্য পায়ের তুলনায় সরু দেখায়, সেটা আস্তে আস্তে হয়তো মোটা হয়ে অন্য পায়ের মতো হবে। প্রথমে কুশ পায়ের গোড়ালি ছোট থাকে, আস্তে আস্তে সেটা মোটা হয়। পায়ের চেটোর ওপরের সেই আবটা, যার উপর ভর দিয়ে আগে হাঁটত ব্যবহারের অভাবে সেটা নিশ্চই এমনিতেই নরম হয়ে যায়, ছোট হয়ে যায়। তবে কবিরাজ যে লাল রঙ এবং বন কালো জিরে, কালো জিরে আর মেথির মলম লাগাতে বলেন তা হয়তো এই আবের নরম হওয়ার ছোট হয়ে মিলিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করে। ফিজিক্যাল মেডিসিনের এক ডাক্তার জানালেন, তারা কোনো মলম দেন না এখানে লাগানোর জন্য। কবিরাজ যে লাল রঙটি দেন দিনের বেলা আবটির ওপর লাগানোর জন্য সেটি সম্পর্কে জনসমক্ষে কবিরাজ বলেছিলেন, 'হিন্দু মতেই বলি, কামাক্ষা মায়ের স্রাব হয় বছরে একবার, ওতে সেই স্রাবের রক্ত দেওয়া আছে'। কিছুটা রঙ আমাদের উনি দিয়েছিলেন, পরীক্ষা করে জানা গেল এটি একটি জৈব রঙ—সে-কথা জানানোর পরে উনি একান্তে জানালেন, এটি একটি গাছ থেকে পাওয়া, বহুদূর (আসাম) থেকে আনতে হয়—তবে গাছের নামটি জানাতে চাননি আপাতত। যাই হোক, কবিরাজ জানালেন, আব কমাতে এই লাল রঙের ভূমিকা আছে। তবে এর একটি উপযোগিতা এই হতে পারে যে, অতঃপর এই লাল রঙ লাগানো জায়গা যেন মাটিতে না পড়ে অর্থাৎ পায়ের চেটো যেন ফের কখনও ভাঁজ না হয়—পা যেন সোজাই মাটিতে পড়ে। আর লাল রঙ হয়তো চিকিৎসা প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা ধর্মীয় দ্যোতনা এনে দেয়। যেমন চিকিৎসা প্রক্রিয়া শেষ হলে কবিরাজ সাতরকম ফুল দিয়ে আরোগ্য স্নান করান। আমাদের লোক-জীবনে বহু—হয়তো সব গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথেই ধর্মীয় অনুষঙ্গ জড়ানো থাকে।

যদিও লোকজনের সামনে কবিরাজ চিকিৎসা প্রক্রিয়াটাকে প্রায় দৈবী চিকিৎসা হিসেবে খাড়া করেছেন—একদিন ট্রেনে যেতে যেতে বলছিলেন, 'বলে দিলে টুক করে ধরে ফেলবে—আসলে কাউকে যদি শেখাই তার এলাকায় আমি আর চিকিৎসা করতে পারব না, সেজন্যই শেখাই না। আমি যার কাছে শিখেছি

তার পেছন পেছন আমি দশ বছর ঘুরেছি, রোগী ধরে এনেছি। বনহুগলি গিয়েও বসে থাকতাম রোগী ধরার জন্য। তার পর উনি আমাকে শিখিয়েছেন। তাঁর এলাকায় আমি কখনও যেতাম না। এখন তার বয়স হয়ে গেছে নব্বই বছর, উনি এখানে ওখানে যেতে পারেন না—তাই এখন মাঝে মাঝে তাঁর এলাকায় যাই।

মন্ত্রপাঠ ফুঁ-দেওয়া এগুলোকে অনেক সময় কুসংস্কারের সূচক হিসাবে দেখে থাকে 'আধুনিক' মানুষ। জল নিয়ে মন্ত্রপাঠ করে জলকে ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন করা হচ্ছে এমনভাবে না দেখে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের আগে মানুষ অনেক সময় দেবতার বা গুরুজনের আশীর্বাদ চায়—অথবা শুধুই প্রার্থনা করে—তেমনভাবে দেখলে দেখাটা অনেক বাস্তবসম্মত হয়। মন্ত্র অনেক সময়ই আশীর্বাদ কামনা বা প্রার্থনার স্তোত্র। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, কোনো অপারেশানের আগে শল্য চিকিৎসক দেবতাকে নমস্কার করলে বা পরীক্ষার আগে ছাত্র মাকে প্রণাম করলে আমরা নিশ্চয়ই ভাবব না যে, দেবতা বা মা অতঃপর তাকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন করে দিলেন এবং তাতেই কার্যসিদ্ধি হবে।

গত তিরিশ বছর ধরে কবিরাজ চিকিৎসা করে চলেছেন। চিকিৎসা করতে চলে যান বাংলাদেশেও। একবার যেখানে যান ক্রমশ সেখানে আশপাশের রোগীরাও আসতে থাকে। সপ্তাহে সপ্তাহে সেখানে যান —রোগীদের অবস্থা দেখে ওষুধ দেন—নির্দেশ দেন। টাকাও নেন সপ্তাহে সপ্তাহে। সাধারণত প্রতি সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট এলাকায় যান। ক্রমশ আশেপাশের রোগীর সংখ্যা কমে আসতে থাকে। ছয় মাস-একবছর বাদে সে এলাকা ত্যাগ করেন।

কবিরাজ-রোগী সম্পর্ক

হয়তো কোনো এলাকা দিয়ে যাচ্ছেন—পরদিন ফের সেখানেই আসতে হবে রোগী দেখতে—থেকে গেলেন কোনো রোগীর বাড়িতেই রাতের বেলা। সেখানেই খাওয়া-দাওয়াও করলেন। এটা করতে হয় কারণ প্রায়ই কবিরাজের বাড়ি থেকে তার ভ্রাম্যমান কাজের জায়গাগুলি খুব দূরে দূরে হয়। দুপুরের খাওয়াটাও প্রায়শ কোনো রোগীর বাড়িতেই সেরে নেন। অনেক সময় কোনো এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় কয়েক বছর আগে চিকিৎসা করা রোগীকে গিয়ে দেখে আসেন। এই কুশ পা চিকিৎসকের সাথে রোগীর বাড়ির সম্পর্ক প্রায় পাড়ার লোক বা গ্রামের লোকের মতোই হয়ে ওঠে। আধুনিক ডাক্তারের সাথে মানুষের সম্পর্কের গম্ভীর ভয়-সম্ভ্রমের দূরত্ব এখানে অনুপস্থিত। কবিরাজ বলেন, 'আমি যদি ভুল চিকিৎসা করি আমার পিঠের চামড়া থাকবে না। হাসপাতালে-নার্সিংহোমে ভুল চিকিৎসা করলে কিন্তু আপানারা ডাক্তারের কলার চেপে ধরতে পারবেন না। অপারেশন করার সময় তারা 'না-দাবি' লিখিয়ে নেয়। আমি গ্রামে গ্রামে যাই, দেখেছি অনেক জায়গায় পোলিও খাইয়ে মানুষকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে—কে তার কি করতে পেরেছে—এজন্যই অনেক জায়গায় গ্রামকে গ্রাম পোলিও বয়কট করে।' এই প্রতিক্রিয়ার কারণ অনেক সময় মানুষ একে জালিয়াত বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। উদ্দেশ্য এবং যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। প্রসঙ্গত তিনি জানালেন, গত এক বছরে কমপক্ষে একশো রোগীর চিকিৎসা তিনি করেছেন। একেবারে প্রত্যেকের নাম লেখা না থাকলেও মোটামুটি তাদের নাম ঠিকানা এবং কতটাকা তিনি তাদের কাছ থেকে পেয়েছেন তা তাঁর খাতায় লেখা থাকে। বর্তমান প্রতিবেদককে তিনি তা দেখাতেও রাজি ছিলেন। যদিও দেখা হয় নি।

কুশ পায়ের আধুনিক চিকিৎসা বিষয়ক কিছু তথ্য

ফিজিক্যাল মেডিসিনের এক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক জানালেন, কুশ পা প্রধানত অর্থোপেডিক সার্জেনদেরই চিকিৎসা করার কথা। তবে তিনি বনহুগলি বিকলাঙ্গদের চিকিৎসা কেন্দ্রের সাথে দীর্ঘদিন যুক্ত থাকলেও এরকম কোনো লোকায়তিক চিকিৎসা চালু আছে তা জানতেন না। জানতে পারি নি, এরকম কত চিকিৎসা চালু আছে তা চিকিৎসা বিজ্ঞান জানে কিনা। তবে ফিজিক্যাল মেডিসিনের বিশেষজ্ঞ জানালেন, তিন থেকে ছয় সপ্তাহ লাগে আধুনিক চিকিৎসায় এদের সেরে উঠতে। সেটা প্লাস্টার করে এবং অপারেশন করলে, উভয় ক্ষেত্রেই। বনহুগলিতে এর চিকিৎসা এবং প্রয়োজনে বিশেষ জুতো (অর্থসিস) পুরোটাই হয় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অবশ্য যদি পরিবারের মাসিক আয় পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে হয়, তবে অবশ্য সাধারণভাবে নার্সিংহোমে এর চিকিৎসা খরচ পাঁচ-ছয় হাজার টাকা থেকে (এক পা হলে) দশ হাজার টাকা (দু-পা হলে) হয়। বিশেষ বিশেষ নার্সিংহোমে এর খরচা বলাইবাহুল্য অনেক বেড়ে যেতে পারে বলে জানালেন তিনি। কবিরাজ যদিও জানালেন, অপারেশন করে সারে না এমন বহু রোগী তিনি দেখেছেন। ফিজিক্যাল মেডিসিনের বিশেষজ্ঞ বললেন, এমন সম্ভাবনা খুবই কম। অপারেশন প্রসঙ্গে তিনি (ডাক্তার) জানালেন, টেন্ডন খুব শক্ত হয়ে গেলে অথবা হাড় বেশি বেঁকে

লক্ষণের বাঁ পায়ের চিকিৎসা শুরু হয় আঠারোই সেপ্টেম্বর দুহাজার চার-এ। এইছবিতে দেখা যাচ্ছে চিকিৎসার প্রায় দুমাস পরে বাঁ পায়ের অবস্থা পাঁচ মাস পরে ডান পায়ের অবস্থা (চিকিৎসা শুরু হয়েছিল বারোই জুলাই দুহাজার চার-এ)। এই ছবি তোলা হয়েছে চোদ্দোই ডিসেম্বর দুহাজার চার-এ। *ছবি : লেখক*

বেড়ে গেলে অপারেশন করতে হয়। হাড় বাঁকা পড়ার ক্ষেত্রে অপারেশন ছাড়া পথ নেই—এক্ষেত্রে হাড় কেটে বাদ দিতে হয়। পঁচিশ বছরের বেশি বয়সীদের ক্ষেত্রেও অপারেশন করা হয়, জানালেন তিনি। তবে এও জানালেন বয়স বাড়লে জটিলতা বাড়ে। পরিসংখ্যান অবশ্য জানতে পারি নি, শতকরা কতজনকে অপারেশন করতেই হয় বা কতজনকেই-বা প্লাস্টার করলেই চলে।

উজ্জ্বল কূপমণ্ডুকতা

এই চিকিৎসার কথা যখন প্রথম জানতে পারি তখনও অব্দি কাছ থেকে চিকিৎসা দেখা হয় নি। দু-একজন রোগীকে দেখেছি মাত্র—অবাক হয়ে অনেককেই বলেছি। 'বিজ্ঞানমনস্ক' অনেক লোককেই দেখেছি অবিশ্বাস পোষণ করতে। আদৌ কিছু হচ্ছে সেটা তারা স্বীকার করতে চান নি। বলেছেন 'ওসব কুসংস্কার, ওসব বলবে না'। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা স্মরণ হচ্ছে। বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার কাজে একজন অক্লান্ত পথিকৃৎ ব্যক্তি এবং আরো বহু লোকের সাথে সুন্দরবন বেড়াতে গেছিলাম। লম্বা লম্বা ঘাসের মতো হেঁতাল গাছ দেখে তাঁকে বললাম, 'তবে যে *মনসামঙ্গলে* আছে চাঁদ সদাগরের হাতে হেঁতালের লাঠি থাকত'। তিনি বললেন, প্রকৃতিকে জানত না ভুলভাল আজগুবি সব গল্প লিখে গেছে (*মনসামঙ্গলে* অবশ্য কালনাগিনীর বিষের কথা আছে। আমরা জানি যাকে কালনাগিনী বলে, তার বিষ নেই)। কিছু পরেই অবশ্য আমরা আরো অনেক হেঁতাল গাছ দেখলাম এবং বুঝতে পারলাম হেঁতাল গাছ থেকে শক্তপোক্ত লাঠি বানানো যায়। লোকসংস্কৃতির সবটাই 'কালনাগিনীর বিষ' নয়। বিজ্ঞানমনস্কতার প্রথম শর্ত তথ্যকে স্বীকার করা এবং যাকে বুঝি না তাকে কুসংস্কার না বলে বোঝার চেষ্টা করা। কথাটা বিচিত্রভাবেই বিস্মৃত হয়েছি আমরা। গত প্রায় তিরিশ বছর ধরে বিজ্ঞান আন্দোলন বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে উঠেছে। লোক সমাজকে বোঝার চেষ্টা না করে এর মধ্যে বুজরুকিকে ধরে ফেলার সস্তা চেষ্টা এবং পশ্চিমী বিজ্ঞান যার প্রধান প্রকাশ তার প্রযুক্তির মধ্যে—যা মূলত গড়ে উঠেছে হিংস্র পশ্চিমী সভ্যতার আয়ুধ হিসেবে তার আধিপত্যকামী তাড়নায়, তার লেজুড়বৃত্তিই করে চলেছি আমরা বিজ্ঞানমনস্কতার নামে।

অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থা যাকে অন্য কথায় বলা যেতে পারে ইন্ডাস্ট্রিয়াল চিকিৎসা ব্যবস্থা তার বিপরীতে আলোচ্য উদাহরণটিকে বলা যেতে পারে চিকিৎসার লোকায়তিক ধারা। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থা বিকাশের ধারাতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রতিদিন অসংখ্য প্রাণী হত্যা করা হয় এবং লুকিয়ে মানুষের উপর প্রয়োগ করা এর স্বভাব। এর বিপরীতে লোকায়তিক চিকিৎসা পদ্ধতি বোঝার এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ভাবনা হিংসামুক্ত সমাজ তৈরির একটি শর্ত।

ডাক্তার সপ্তাহে সপ্তাহে বাড়ি এসে চিকিৎসা করে দিয়ে যাচ্ছে। ডাক্তারখানায় যাওয়ার জন্য সময় এবং অর্থব্যয় নেই। সহজ উপকরণ এবং সরল চিকিৎসা পদ্ধতি। সাফল্যের অতি উচ্চ হার, একদিনের জনের দামও ছাড়তে হলো না এবং চিকিৎসকের সঙ্গে সম্পর্কের সহজভাব—এই সবগুলি জিনিসকেই বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে কেবল চিকিৎসা এবং রোগ নিরাময় ছাড়াও এই চিকিৎসা পদ্ধতির মূল্যায়নের সময়। □

প্রযুক্তি নিয়ে অগোছানো কথা

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

পেটেন্ট নিয়ে কথা হয়েছে অনেক। না-বলা কথা আরো বেশি। শুভেন্দু দাশগুপ্ত একরকমভাবে কিছু কথা, কিছু প্রশ্ন আমাদের কাছে তুলেছেন। বলেছেন ট্রিপস অর্থাৎ ট্রেড রিলেটেড ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস-এর কথাও। তবে আরও কিছু কথা এখনও বাকি। সেই সব প্রশ্ন কথা সামনে আনার বিষয়টি আরো প্রাসঙ্গিকতা পেয়েছে সম্প্রতি দুহাজার পাঁচ সালের জানুয়ারি থেকে ভারতে পেটেন্ট আইন চালু করা নিয়ে। বিষয়টি খতিয়ে ভাবার দায়-দায়িত্ব তাই আমাদের আরো গভীর হল। সুতরাং প্রশ্ন তোলা আর উত্তর খোঁজার প্রক্রিয়াটি চলতে থাকুক।
স.ম.

'বিশ্বায়ন' শব্দটার এবং বিষয়টার অনেকরকম মানে অনেকরকম ধারণা তৈরি হয়েছে। এখনও হচ্ছে হয়ে চলেছে।

বিশ্বায়নের মানের সঙ্গে ধারণার সঙ্গে জড়িয়ে আছে জড়িয়ে যাচ্ছে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, দর্শন, আইন, ভূগোল, জ্ঞানচর্চা, প্রকৃতি, পরিবেশ আরও অনেক কিছু এবং প্রযুক্তি।

বিশ্বায়নের অর্থনীতির কয়েকটা বিষয় অবাধ বাজার, নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতি, বেসরকারি উদ্যোগ। এই অর্থনীতি সাজাতে প্রযুক্তির একটা বিশাল ভূমিকা তৈরি হয়েছে, তৈরি করা হয়েছে।

অর্থনীতি নির্মাণে প্রযুক্তি সব সময় ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু অর্থনীতির নির্দিষ্ট প্রয়োজনে রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাসের দায়বদ্ধতায় প্রযুক্তির ওপর একটা নিয়ন্ত্রণ ছিল। সেই নিয়ন্ত্রণ এখন আর নেই। এখন অর্থনীতি বাণিজ্য নির্ভর, আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যই এখন আর্থনীতিক উন্নতির প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে স্বীকৃত। এই বাণিজ্যনির্ভর মুনাফানির্ভর পুঁজিনির্ভর অর্থনীতিতে প্রযুক্তির এখন সর্বগ্রাসী আধিপত্য।

বিশ্বায়ন অর্থনীতির লিখিত চেহারা বিশ্ববাণিজ্য নীতি বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নীতি। ডাকনাম ডব্লিউ.টি.ও.। ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন।

এই নীতির একটা জরুরি বিষয় বাণিজ্য সম্পর্কিত মেধাস্বত্বের অধিকার। ডাকনাম ট্রিপস, ট্রেড রিলেটেড ইনটেলেচুয়াল প্রপার্টি রাইটস্।

একজনের মেধা দিয়ে, মেধা কাজে লাগিয়ে ভাবনা চিন্তা দিয়ে গবেষণা দিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা দিয়ে একটা প্রযুক্তি তৈরি হল। যার মেধা সে প্রযুক্তি তৈরির জন্য দাম চাইল। সমাজ রাষ্ট্র সরকার প্রশাসন বলল ব্যক্তিমেধা দাম চাইতে পারে না, কারণ ব্যক্তি তার মেধা তৈরি করে সঞ্চিত সামাজিক জ্ঞান সামাজিক মেধা থেকে। ব্যক্তি ও সমাজের এই সম্পর্কে, এই দ্বন্দ্বে একটা সমঝোতায় পৌঁছতে হল। ব্যক্তি বলল তার মেধার দাম না পেলে সে আর সন্ধান করবে না, পরীক্ষা চালাবে না, গবেষণা করবে না, উদ্ভাবন করবে না। সমাজ ভাবল, এতে সমাজ এগোবে না, সভ্যতা এগোবে না এই সব। সমঝোতার চেহারা হল চুক্তি। চুক্তির নাম পেটেন্ট। ব্যক্তি তার মেধার দাম পেল। তবে সমাজেরও নিয়ন্ত্রণ থাকল। ব্যক্তির পুরো অধিকার নিয়ন্ত্রণ থাকল না। ব্যক্তির মেধায় যে প্রযুক্তি তৈরি হল তাতে ব্যক্তিও থাকল। সমাজও থাকল। প্রযুক্তির প্রয়োগে সমাজের কথা থাকল।

বিশ্বায়ন এবং বিশ্ববাণিজ্য নীতির মধ্যে দিয়ে যে নতুন মেধাস্বত্বের ধারণা

এল, নিয়ে আসা হল সেখানে সমাজকে সরিয়ে দিয়ে ব্যক্তি সামনে চলে এল। প্রযুক্তি তৈরি করতে ব্যক্তি অবাধ হয়ে উঠল। তার মেধায় মেধাস্বত্বে, মেধা থেকে প্রযুক্তি উদ্ভাবনে, প্রযুক্তি স্বত্বে ব্যক্তির অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ অবাধ হয়ে উঠল।

বিশ্ববাণিজ্য নীতির মেধাস্বত্বের নীতি নিয়মকানুন তৈরি হল সমাজ নয় ব্যক্তির কথা মাথায় রেখে।

উদ্ভিদজগত ও প্রাণীজগতের যে কোনো উপাদান সদস্য, বিষয়ের উপর সন্ধান গবেষণা, পরীক্ষা এর মধ্যে দিয়ে যে উদ্ভাবন যে কোনো উদ্ভাবন সেই উদ্ভাবনের স্বত্ব পুরোপুরি ব্যক্তির, সমাজের কোনো অধিকার দায়িত্ব অংশীদারী থাকবে না। প্রকৃতির ওপর উদ্ভিদজগতের ওপর প্রাণীজগতের ওপর ব্যক্তি মানুষের দখলদারি অবাধ হল। এতদিন সমাজ প্রকৃতির ওপর ব্যক্তির মেধাস্বত্বের যে দাবি প্রতিরোধ করে এসেছে তা ভেঙে গেল। প্রকৃতিকে জয় করবার যে ইচ্ছা মানুষের মনে এতদিন ধরে ছিল তা অনেকটা সফল হল।

এবং যেহেতু এখন সন্ধান গবেষণা পরীক্ষা উদ্ভাবন প্রযুক্তি আর ব্যক্তির উদ্যোগে নয়। সামাজিক সংস্থায় নয়, পুঁজির উদ্যোগে, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে, প্রকৃতির ওপর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের দখলদারি। মেধাস্বত্বের নতুন নিয়ম বানিয়েছে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা। নিয়মের নাম বাণিজ্য সম্পর্কিত মেধাস্বত্বের অধিকার, ট্রেড রিলেটেড ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস্, ট্রিপস।

ট্রিপসে এই নতুন মেধাস্বত্বের অধিকারে বলা হল এই পৃথিবীর যে কোনো বিষয় প্রাণী জগৎ উদ্ভিদ জগৎ বস্তু জগৎ, ব্যক্তির গবেষণার বিষয়, প্রযুক্তি উদ্ভাবনের বিষয়, প্রয়োজন অনুযায়ী হস্তক্ষেপ এবং পরিবর্তনের বিষয়, এবং এই উদ্ভাবিত প্রযুক্তির ওপর ব্যক্তির মেধাস্বত্বের অধিকার নিয়ন্ত্রণহীন। কোনো সামাজিক বিষয় দিয়ে দার্শনিক বিষয়, কোনো নৈতিক বিষয় দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করা যাবে না। মেধাস্বত্বকে কোনো স্বল্প সময় সীমা দিয়ে কোনো অর্থনৈতিক ধারণা দিয়ে কোনো দেশজ পরিস্থিতি দিয়ে সীমাবদ্ধ করা যাবে না। বিষয়, সময়, দেশ, নীতি, প্রয়োজন, সমাজ সব কিছুর বাধা ছাড়িয়ে সবার উপরে স্থাপিত হল প্রযুক্তি, প্রযুক্তি নিয়ে মেধাস্বত্ব এবং মেধাস্বত্ব নিয়ে ব্যক্তির অধিকার। নতুন মেধাস্বত্বের ধারা-উপধারায় এর প্রতিফলন। আর এই প্রযুক্তি, গবেষণা, উদ্ভাবন, মেধাস্বত্বের নিয়ম প্রতিষ্ঠা এই সবই পুঁজি, বিশাল পুঁজিনির্ভর যা ব্যক্তির সাধ্যের বাইরে তাই এই ব্যক্তি আসলে প্রতিষ্ঠানের অংশ, আসল ক্ষমতা প্রতিষ্ঠানের হাতে।

অর্থনীতির সঙ্গে প্রযুক্তির সম্পর্ক প্রথমদিন থেকেই। অর্থনীতিকে অনেকের কথা শুনে চলতে হয়। সমাজের গোষ্ঠীর, রাজনীতির, ভূগোলের, ইতিহাসের, ব্যক্তির, স্বার্থের এবং প্রযুক্তির। কখন কার কোন্ কথা অর্থনীতিকে শুনতে হবে শুনতেই হবে, কতটা শুনতে হবে সেটা নানা কিছুর ওপর নির্ভর করে। তেমনি অর্থনীতি প্রযুক্তি সম্পর্কে, কোন্ প্রযুক্তি, কেমন প্রযুক্তি, কার প্রযুক্তি কতটা অর্থনীতিতে আসবে, নেওয়া হবে সেটাও নির্ভর করে নানা কিছুর ওপর।

যেমন আমরা যখন পরাধীন ছিলাম, পরাধীনতার পথ ধরে বাইরের প্রযুক্তি আমাদের অর্থনীতিতে এসেছে। আমরা পরাধীনতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ দিয়ে আমাদের প্রযুক্তি দিয়ে আমাদের অর্থনীতি বানাতে চেয়েছি বানিয়েছি। 'ওদের' শাসন 'আমাদের' দেশ, 'ওদের' অর্থনীতি নিয়ম 'আমাদের' আর্থনীতিক প্রয়োজন, 'ওদের' নির্মাণ 'আমাদের' নির্মাণ, 'ওদের' প্রযুক্তি 'আমাদের' প্রযুক্তি, প্রযুক্তির 'আমাদের' 'ওদের' হল। প্রযুক্তি স্বদেশ বিদেশ হল।

প্রযুক্তির ঘর বাহির হল। প্রযুক্তির স্বাদেশিকতা হল। প্রযুক্তির রাজনীতি হল। স্বাধীনতার পর স্বাধীন দেশ নির্মাণ। স্বাধীনভাবে দেশ নির্মাণ। দেশ নির্মাণে প্রযুক্তির প্রশ্ন এল। বিদেশ থেকে আনা প্রযুক্তির বিপরীতে স্বদেশে প্রযুক্তি তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হল। স্বাধীনতা উত্তর স্বয়ংনির্ভর স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির প্রয়োজনে স্বদেশে প্রযুক্তি বানানোর উদ্যোগ। যেহেতু অর্থনীতি নির্মাণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের এবং সরকারের হাতে নেওয়া হল, প্রযুক্তি তৈরির দায়িত্বও তাদের সরকারি প্রতিষ্ঠানের, কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ সি আই আর, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ আই সি এ আর, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ, আই. সি. এম. আর. ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, ডি.আর.ডি.ও. সরকারি উৎপাদন সংস্থার গবেষণাগার, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগার। প্রযুক্তির স্বদেশ প্রযুক্তির স্বাদেশিকতা মেনে

নেওয়া হল। রাজনীতি দিয়ে অর্থনীতি দিয়ে প্রযুক্তিকে ভাবা হল।

স্বদেশে প্রযুক্তি তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হল। কিন্তু স্বদেশে নির্মাণে পুরোপুরি স্বদেশের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হল না। বিদেশের প্রযুক্তি বিদেশী প্রযুক্তি থাকল এল। পুঁজিবাদী দেশ সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে আলাদা আলাদা সূত্রে প্রযুক্তি এল কিন্তু প্রযুক্তির ধরণ একই প্রযুক্তির পুঁজিবাদ আর সমাজবাদ হল না অন্তত আমাদের দেশে। বিদেশ থেকে আসা প্রযুক্তি থেকে গেল, বিদেশী প্রযুক্তি থেকে গেল, আবার স্বদেশে তৈরি প্রযুক্তি থাকল, খুব অল্প জায়গায় স্বদেশী প্রযুক্তিও।

প্রযুক্তি তৈরি করা, ব্যবহার করা প্রযুক্তি আনা না-নানা সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকল এবং থাকল না। কিন্তু প্রযুক্তি নিয়ে মেধাস্বত্বের ব্যক্তির অধিকারের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকল। পেটেন্ট আইন 1970। ব্যক্তির মেধাস্বত্বের অধিকারের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ। কোন্ কোন্ বিষয়ের ওপর অধিকার, কি ধরণের অধিকার কত দিনের জন্য অধিকার, ব্যক্তির অধিকারের ওপর সরকারি অধিকার বহন ও কেন এই সব থাকল। প্রযুক্তি সেভাবেই তৈরি হল, ব্যবহার হল, প্রযুক্তির ওপর দেশীয় রাজনীতি স্বদেশী রাজনীতি।

বিশ্ববাণিজ্য নীতির নিয়ম মেনে আমাদের দেশে নতুন পেটেন্ট আইন তৈরি হল। ব্যক্তির মেধাস্বত্বের যে অধিকারগুলো না মেনে অল্প মেনে রাখা হয়েছিল সেই সব অধিকার এবার মেনে নেওয়া হল। প্রযুক্তি নিয়ে বিশ্বরাজনীতি।

একটা তর্ক ছিল। প্রযুক্তির তো একটা ইতিহাস একটা ভূগোল একটা সমাজ একটা সংস্কৃতি একটা দেশ থাকে। প্রযুক্তি সর্বজনীন দেশকাল নিরপেক্ষ হয় কিনা, সব প্রযুক্তি সব জায়গায় গ্রহণীয় হয় না কি, এই তর্ক আমাদের দেশে উঠেছিল, জমে নি।

আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল রাজনৈতিক লড়াই, এবং অর্থনৈতিক লড়াইও। রাজনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াই, অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক লড়াই। বাইরের থেকে আমাদের ঘরে যা নিয়ে আসা হচ্ছে তা আমরাও বানাতে পারি। বাইরের লোকেরা আমাদের ঘরে যা বানাচ্ছে তা আমরাও বানাতে পারি। বাইরের লোকেরা যেভাবে বানাচ্ছে যে প্রযুক্তিতে, সেভাবে সে প্রযুক্তি আমরাও বানাতে পারি। ওদের মতো আমাদের প্রযুক্তি এখানেই থেমে থাকে নি। ওদের মতো আমাদের প্রযুক্তির বাইরে আমাদের মতো আমাদের প্রযুক্তি ভাবা হল, এই আমাদের প্রযুক্তি, আমাদের ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ, সংস্কৃতি, জ্ঞান, প্রয়োজন রসদ সাধ্য ভেবে তৈরি হলো, পণ্য বানালো। স্বাধীনতা উত্তর কালে দেশ গঠনে, অর্থনীতির নির্মাণে প্রযুক্তি নির্মাণে এই আমাদের প্রযুক্তি অবহেলিত হল। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে প্রাকউপনিবেশিক দেশজ প্রযুক্তির বিকাশের ধারা বাধা পেয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসনকালে স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশ হিসাবে যে প্রযুক্তি আবার নতুন করে বানানো স্বাধীনতা উত্তর-কালে রাষ্ট্রনির্ভর দেশ ও অর্থনীতি নির্মাণে আবার সেই দেশীয় প্রযুক্তির ধারাকে বাতিল করা হল। সরকারি প্রযুক্তি গবেষণা ব্যবস্থা ও গবেষণা কেন্দ্র, সরকারি উৎপাদন সংস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহারে, প্রযুক্তি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে দেশীয় প্রযুক্তিকে কোনো জায়গা দেওয়া হল না। এই নিয়ে তেমন জোরালো তর্ক হল না কোথাও, বিজ্ঞানী প্রযুক্তিবিদ, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিক দল কোথাও না। সবাই মেনে নিলাম আধুনিকতার প্রকল্পে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োজন। আধুনিক প্রযুক্তি মানে বিদেশী প্রযুক্তি এবং দেশীয় প্রযুক্তি অ-আধুনিক। যেটুকু তর্ক তোলার তুলল গান্ধিবাদী দর্শনের মানুষ জন সমাজতন্ত্রী ভাবধারার লোকজন, এরা তখন ভাবনার জগতে কোণঠাসা।

বিশ্ববাণিজ্য নীতির প্রযুক্তি নিয়ে নিয়মনীতি এই তর্কটা শেষ করে দিল কিংবা হয়তো আবার শুরু করল। সারা পৃথিবীকে একটা অর্থনীতি ধরে নিয়ে চেয়ে নিয়ে সারা পৃথিবীর জন্য একটা অর্থনীতি একটা বাণিজ্য নীতি, বিশ্বায়ন একটাই বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন ডব্লিউ.টি.ও। একধরণের নির্মাণ একধরণের প্রযুক্তি একটা প্রযুক্তি নীতি একটা মেধাস্বত্ব অধিকার ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস্ আই. পি. আর., ব্যক্তির এবং পুঁজির মেধাস্বত্বের অধিকার। প্রযুক্তির আর স্বদেশ বিদেশ নেই, ভূগোল নেই। প্রযুক্তি এখন বাণিজ্যিক পণ্য, বাণিজ্য সম্পর্কিত মেধাস্বত্বের অধিকার ট্রেড রিলেটেড ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস—ট্রিপস।

এবং এই প্রযুক্তি বাণিজ্য। প্রযুক্তির বাণিজ্য এক ধরণের দেশ থেকে আরেকধরণের দেশে। আরেক ধরণের

দেশ থেকে এক ধরণের দেশে নয়। প্রযুক্তি বাণিজ্যের জন্য যেখানে প্রযুক্তি পাঠানো সেখানকার অর্থনীতিকে এই প্রযুক্তির জন্য সাজিয়ে নেওয়া। অর্থনীতির জন্য প্রযুক্তি নয়, প্রযুক্তির জন্য অর্থনীতি। প্রযুক্তির ক্ষমতা দিয়ে অর্থনীতির ওপর আধিপত্য।

একদিন প্রযুক্তি ভাবা হয়েছিল অর্থনীতির কথা মাথায় রেখে। এটা বোঝা গিয়েছিল অর্থনীতিতে আধিপত্য আনা যায়, প্রযুক্তির ওপর আধিপত্য থাকলে, প্রযুক্তির ওপর অধিপত্য এক অনন্ত যাত্রা পথ। প্রযুক্তির জন্য বিনিয়োগ, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রযুক্তি প্রয়োগ, মুনাফা, মুনাফার একটা অংশ আবার প্রযুক্তির জন্য বিনিয়োগ এইভাবে চলা। এই চলা থামালে অর্থনীতির ওপর আধিপত্য থেমে যাবে। আজ যে প্রযুক্তি আধুনিক যাকে দিয়ে অর্থনীতিতে আধিপত্য পাওয়া যাবে কাল সেই প্রযুক্তি পুরনো, আরেকটা প্রযুক্তি তৈরি হয়েছে যে আধুনিক প্রযুক্তির যাত্রাপথে প্রতিক্ষণে প্রযুক্তি পুরনো হয়ে চলেছে, অথচ এই প্রযুক্তি থেকে মুনাফা না পেলে পরের প্রযুক্তির জন্য বিনিয়োগে টান পড়বে। প্রযুক্তি তখন উৎপাদন সহায়ক হবার বাইরে আরেকটা চরিত্র পেল, প্রযুক্তি নিজেই পণ্য হয়ে গেল, যার বিনিয়োগ আছে, উৎপাদন আছে, বেচাকেনা করা যায়, বাজার আছে, বাজার খোঁজা যায়, বাজার পাওয়া গেল। অন্য দেশের উৎপাদন, অন্য দেশের প্রযুক্তি, অন্য দেশের অর্থনীতি সেই বাজারে। সেই অন্য দেশ আমাদের দেশ।

আমাদের দেশে সেই প্রযুক্তি বেচতে গেলে, উৎপাদন ব্যবস্থাকে সেই প্রযুক্তির মতো করে গড়ে তুলতে হবে অর্থনীতিকে, সেই উৎপাদন ব্যবস্থার মতো করে সাজাতে হবে। এখন অর্থনীতির জন্য প্রযুক্তি নয়, প্রযুক্তির জন্য অর্থনীতি।

প্রযুক্তির এই ক্ষমতা লিখে রাখা হল। বিশ্ববাণিজ্য নীতির ধারায় ট্রিপস-এ।

প্রযুক্তির বিদেশী প্রযুক্তির এই আধিপত্যের বিরোধিতায় আমরা কোথায়। আমাদের স্বদেশী প্রযুক্তি কোথায়, প্রযুক্তি স্বাদেশিকতা কোথায়।

স্বাধীনতা উত্তর কালে অর্থনীতি তৈরির দায়িত্ব পেল রাষ্ট্র এবং সরকার। প্রযুক্তির দায়িত্ব নিল সরকার, সরকারি প্রতিষ্ঠান। পরিকল্পনার অর্থনীতির পাশাপাশি পরিকল্পনার প্রযুক্তি, সরকারি প্রযুক্তি, স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে প্রযুক্তির নানা ধারা ছিল। স্বাধীনতা উত্তরকালে সব ধারা অবহেলিত অসমর্থিত, স্বীকৃত শুধু প্রযুক্তির সরকারি ধারা। বিশ্বায়ন পরবর্তী অর্থনীতিতে দেশীয় সরকারের সরে যাওয়া সরকারি নিয়ন্ত্রণে সরকারি উদ্যোগ সরকারি সমর্থন অস্বীকৃত। পরিকল্পনার প্রযুক্তির স্বীকারে বহুপ্রযুক্তির অস্বীকার, বিশ্বায়ন প্রযুক্তির স্বীকারে দেশীয় সরকারি পরিকল্পনা প্রযুক্তির অস্বীকার। আমরা এখন 'আমাদের' প্রযুক্তিহীন, আমরা এখন 'ওদের' প্রযুক্তির আধিপত্যে।

স্বাধীনতা পূর্ব কালে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় সংগ্রামের অংশ হিসাবে প্রযুক্তির নির্মাণ 'ওদের' প্রযুক্তির বিরুদ্ধে 'আমাদের' প্রযুক্তির নির্মাণ । প্রযুক্তির স্বদেশিকতা।

বিশ্বায়নের অর্থনীতিতে অংশগ্রহণে আমাদের একটা অর্থনীতি থাকবে না। অনেক অর্থনীতি হবে, অনেক স্তরে। এক একটা স্তরে অর্থনীতির, নির্মাণের, উৎপাদকের মালিকানার, পণ্যের দামের, ক্রেতার বিক্রেতার, বাজারের এক এক রকম চেহারা। এক একটা স্তরের এক একরকম মান্যতা ও অমান্যতা, অমান্যতায় প্রযুক্তির নতুন করে জন্ম নেওয়া, আমাদের প্রযুক্তি আবার বানানো। 'ওদের' প্রযুক্তির বিরুদ্ধে। আবার প্রযুক্তির স্বাদেশিকতা।

এই 'আমাদের' প্রযুক্তি নিয়ে কথা উঠুক। অনেক অনেক কথা হোক। রাজনীতি আবার কথা শোনাক প্রযুক্তিকে।

এই রাজনীতিতে থাকবে একটা দেশের ভূগোল, ইতিহাস, দর্শন, জ্ঞান, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, পরিবেশ, মানুষ।

এই রাজনীতি বলবে আমাদের কি চাই, কতটা চাই, কেন চাই, কিভাবে চাই, কারা চাই, আমাদের কি আছে, কতটা আছে কোথায় আছে, যা আছে তা কিভাবে আছে, কিভাবে থাকবে, রাখব এই সব প্রশ্ন আর উত্তর। এই সব প্রশ্ন আর উত্তরে ঠিক হবে প্রযুক্তির ধরণ। এই সব প্রশ্ন তৈরি আর উত্তর খোঁজায় থাকবে, থাকা দরকার সবার। □

নোবেল শান্তি পুরস্কার দুহাজার চার

মনীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

সারাবিশ্বে পুরস্কারে সর্বোচ্চ ধাপ বোধ হয় নোবেল পুরস্কার। এযাবৎ বিভিন্ন বিষয়ে নোবেল পাওয়া লোকদের তালিকাও বিরাট। তার প্রসঙ্গও আলাদ। এখানে বলার বিষয় 2004 সালের শান্তি পুরস্কার পাওয়া কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা ওয়াঙ্গিরী মাথাই-এর কথা। কারণ তিনি কাজ করেছেন সম্পূর্ণ পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মানুষদের মধ্যে, তাদের উন্নয়ন এবং পরিবেশ বিষয়ক ভাবনাকে জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে। ক্রমাগতই দূষিত হয়ে ওঠা পৃথিবীতে এরকম একজন পরিবেশবাদী এবং উন্নয়নকামীর পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার ঘটনা আমাদেরও কিছুটা নাড়া দেয়। **স.ম.**

আফ্রিকার কেনিয়ার পরিবেশ ও নারীকল্যাণ কর্মী শ্রীমতী ওয়াঙ্গিরী মাথাই এবার নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন। বিশ বছর আগে শ্রীমতী মাথাই বিকল্প নোবেল পুরস্কারও পেয়েছিলেন। এতাবৎকাল সাধারণত রাষ্ট্রনায়ক, কূটনীতিক বা বড় প্রশাসকরাই নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়ে আসছেন। শান্তি পুরস্কার কমিটি এবারে সেই ধারা থেকে সরে এসে, দরিদ্র গ্রামাঞ্চলে বনসৃজন পরিবেশ পুনরুজ্জীবন ও নারীকল্যাণের কাজকর্ম যে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের নির্ভরযোগ্য সোপান এইরকম ভাবনা-চিন্তায় যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হচ্ছেন। ইরাকে আমেরিকার সাম্প্রতিক জঙ্গিপনার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই অনেকে নোবেল কমিটির মনোভাবের এই পরিবর্তন দেখছেন। ইরাকে আমেরিকার আগ্রাসন বিশ্বের তাবৎ জ্ঞানী-গুণী-মানুষদের উদ্বিগ্ন করে দিয়েছে। বিচলিত শান্তিকামী মানুষজন শান্তির বিকল্প পথ সন্ধান করছেন।

নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্যে এবার রেকর্ড সংখ্যক 149টি মনোনয়ন জমা পড়েছিল। এই মনোনয়নের মধ্যে রাষ্ট্রসংঘের প্রধান অস্ত্রপরিদর্শক হান্স ব্লিকের নাম যেমন ছিল, তেমনি রাষ্ট্রসংঘের পরমাণুশক্তি প্রহরী মহম্মদ এল বরাদেই-এর নামও ছিল। এই দুজন ছাড়াও অন্যান্য শক্তিশালী আরো বড় বড় নাম বাদ দিয়ে ওয়াঙ্গিরী মাথাই-এর নির্বাচন নানাদিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। এই পুরস্কারের মূল্য 13 লক্ষ (1.3 মিলিয়ান) মার্কিন ডলার এবং আলফ্রেড নোবেলের ব্যবস্থানুযায়ী নরওয়ে থেকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

ওয়াঙ্গিরী মাথাই-এর সাথে ভারতীয় পরিবেশ ও নারীবাদীদের সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ যে, সংশ্লিষ্ট ভারতীয় মহল মাথাই-এর বিষয়কে নিজেদের একজনের বিষয় বলেই মনে করে উল্লসিত। শ্রীমতী বন্দনা শিবার সঙ্গে ওয়াঙ্গিরী-র অনেকদিনের সম্পর্ক। তাঁর কন্যা গ্রিন পিস কর্মী ওয়াঞ্জিরা মাথাই ভারতের রামগড়ে অনেকদিন গান্ধিবাদ অধ্যয়ন করে গেছেন। ওয়াঙ্গিরী মাথাই-এর জন্ম 1940 সালে কেনিয়ার নাইরোবিতে। তিনি আমেকিার কানসাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জীববিজ্ঞানে স্নাতক হন। পিটস্‌বার্গ থেকে ভেটেরিনারি মেডিসিনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি আর নাইরোবি বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচডি ডিগ্রি নিয়ে সেখানে ফ্যাকাল্‌টি হিসাবে যোগ দেন এবং ক্রমে প্রফেসার হয়ে বিভাগীয় প্রধান হন। বলাই বাহুল্য, পুরুষ প্রধান অনুন্নত আফ্রিকার একটি অঞ্চলে শিক্ষা বা কর্মক্ষেত্রে তার প্রবেশ ও ক্রমোন্নোতির পথ কখনোই মসৃণ ছিল না। পদে পদে প্রতিবন্ধকতা শুধু নারী হওয়ার জন্যেই। সেই সময়ে

কেনিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন একনায়ক ড্যানিয়েল আরাপ মই (1978-2002)। প্রেসিডেন্ট মই ও তার সরকার সমস্ত পরিবেশবাদী ও বন্যপ্রাণী সুরক্ষার অন্দোলনগুলিকে কঠোরভাবে দমন করে গেছেন। শ্রীমতী মাথাই আন্দোলন সংগঠন ও পরিচালনা করে বহুবার নিগৃহীত হয়েছেন, জেল খেটেছেন। 1950-এর দশকের শেষদিকে উহুরুপার্ক নামে বিশাল বিশাল বহুতল অট্টালিকার অত্যাধুনিক একটি নগরী পরিকল্পনা প্রেসিডেন্ট মই অনুমোদন করেন। পরিবেশবাদীরা তার বিরোধিতা করে আন্দোলনে নামেন। এই পরিকল্পনা রূপায়িত হলে বন্যপ্রাণী ও প্রাচুর্যভরা অরণ্য সম্পদের ভয়ঙ্কর ক্ষতি হত, পরিবেশবাদী আন্দোলনকারীরা তাই এই পরিকল্পনা রোখার জন্য জোরালো আন্দোলন করতে বাধ্য হন এবং সফলও হন। মই সরকার মাথাই-এর বিরুদ্ধে শুধু অত্যাচারই নয় নানাবিধ কুৎসাও রটনা করেন 1997 সালে ওয়াঙ্গিরী মাথাই ড্যানিয়েল মই-এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। 1998 সালে মই সরকার বহুশত একর অরণ্যাঞ্চল ধ্বংস করে বিলাসবহুল এক নগরী তৈরির আর এক পরিকল্পনা করেন। এটা রোখবার জন্য ওয়াঙ্গিরী মাথাই ও তাঁর সহকর্মীরা মরণপণ লড়াইয়ে নামেন। পুলিশের প্রহারে তিনি মাথায় গুরুতর আঘাত পান। বহুবার কারারুদ্ধ হন। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রচেষ্টায় তিনি জেল থেকে ছাড়া পান। পার্লামেন্টের সদস্য হওয়ার জন্যে আবারো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, কিন্তু হেরে যান। প্রেসিডেন্ট পদের জন্য তিনি মনোয়ন দাখিল করেন কিন্তু ভোটের মাত্র কয়েকদিন আগে যে দল তাঁকে মনোনয়ন দিয়েছিল তারা তাঁকে কিছু না জানিয়ে মনোয়ন প্রত্যাহার করে নেয়। 1980 সালেই তাঁর স্বামী তাঁকে ডিভোর্স করেন। ভদ্রলোক বলেন, তাঁর স্ত্রী বড় বেশি শিক্ষিতা, অনেক বেশি শক্তিশালী, বড় বেশি সফলা। সে এতই জেদি যে তাঁকে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। অতএব বিবাহ-বিচ্ছেদ। তাঁদের তিনটি সন্তান আছে।

2002 সালে কেনিয়ার রাজনৈতিক পরিবর্তন হল। ড্যানিয়েল মইকে পরাজিত করে বিরোধী নেতা মোয়াই কিবাবী প্রেসিডেন্ট হলেন। তাঁর সরকার ওয়াঙ্গিরী মাথাইকে পরিবেশ, প্রকৃতিক সম্পদ ও বন্যপ্রাণী দপ্তরের ডেপুটি মন্ত্রী নির্বাচিত করলেন। 1997 সালে নিজের বাড়ির পিছনে বৃক্ষরোপণ দিয়ে শুরু হল তাঁর আজকের বিখ্যাত সবুজ বলয় আন্দোলন (Green Belt Movement)। আগে একশটা গাছ কাটা হলে লাগানো হত মাত্র সাতটি গাছ। শ্রীমতী মাথাই তাঁর বিজ্ঞান শিক্ষা ও আফ্রিকার গ্রামীণ অভিজ্ঞতা থেকে বৃক্ষের প্রকৃত মূল্য বুঝতেন। গাছপালা ও মাটির সবুজ আস্তরণ ভূমিক্ষয় রোধ করে, মরুকরণ (desertification) আটকায়, বৃষ্টি ও বন্যার জলের ভূগর্ভে প্রবেশ্যতা বাড়ায় (Ground water recharging) এবং গ্রামের মহিলাদের বিশেষ প্রয়োজন জ্বালানির দীর্ঘমেয়াদি (sustainable) উৎস হিসাবে কাজ করে। তিনি মহিলাদের বোঝাতে সক্ষম হলেন যে, উন্নতপ্রযুক্তি ও প্রচুর আর্থিক সাহায্য ছাড়াই নিজেদের উদ্যোগে তাঁরা গাছ লাগাতে ও রক্ষা করতে পারেন। এইভাবে নিজেদের ভাগ্য ফেরাতে পারেন। 3 কোটি (30 মিলিয়ন) গাছ সফলভাবে লাগানোর তাঁর কর্মসুচি অন্যান্য অনেক দেশই গ্রহণ করে পরিবেশকে উন্নত করেছেন। ওয়াঙ্গিরী মাথাই বলেন, "শান্তির জন্য পরিবেশ সুরক্ষা ভীষণ জরুরি, কারণ আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ যখন আমরা বিনষ্ট করে ফেলি, তখন অবশিষ্ট সামান্য সম্পদের জন্য আমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরি।"

নোবেল শান্তি পুরস্কার কমিটি তাঁদের মানপত্রে বলেছেন যে, শ্রীমতী ওয়াঙ্গিরী মাথাই "দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছেন তাতে গণতন্ত্র মানবাধিকার সুরক্ষা এবং বিশেষ করে নারী কল্যাণ নারী অধিকার সমধিক গুরুত্ব পায়। তার ভাবনাচিন্তা সামগ্রিকভাবে বিশ্বকে নিয়ে, কিন্তু তিনি কাজ করেন স্থানীয়ভাবে (thinks globally, acts locally)। নোবেল কমিটি মনে করেন, শ্রীমতী মাথাই "দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন, গণতন্ত্র ও শান্তির জন্য আগ্রহী সকল আফ্রিকাবাসীর কাছে অনুপ্রেরণা ও আদর্শ।"

স্থায়ীশান্তির ভিত্তি

শান্তির প্রসঙ্গ উঠলেই সাধারণভাবে মানুষের মনে যুদ্ধ সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষ, বিদ্রোহ, বিপ্লবের কথা মনে আসে। এটা আংশিকভাবে সত্য হলেও এই ধারণায় সমগ্র সত্য নেই।

যুদ্ধ বিদ্রোহাদির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিষয়-প্রতিক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের প্রাণ ও সম্পদের ধ্বংস ক্রমবর্দ্ধমান।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতিতে সামরিক বাহিনীর প্রাণহানি ক্রমাগত কমে যাচ্ছে, বেড়ে যাচ্ছে শিশু-বৃদ্ধ, নারীসহ অসামরিক জনসাধারণের সম্পদ ও জীবনহানি। ভিয়েত নাম, কসোভো, আফগানিস্থান, ইরাক প্রভৃতি এসবের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। শান্তির সদিচ্ছায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধান্তে স্থাপিত হয় লিগ অফ নেশনস্; আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধান্তে হয় ইউনাইটেড নেশনস্। তবুও যুদ্ধ থামছে না। স্থায়ী শান্তি এখনও মরীচিকা। দেশে দেশে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাই স্থাপিত হয়েছে ইনস্টিটিউট বা ডিপার্টমেন্ট অব পিস স্টাডিজ।

অন্যদিকে আরো বড় অশান্তি সর্বকালে সব সময় ছিল এবং তার সাথে যুদ্ধ-বিদ্রোহ, বিপ্লবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এইদিকটা চট করে মনে আসে না। পৃথিবীর ব্যাপক অঞ্চলে মানবজাতির যে বৃহত্তর অংশ দারিদ্র্য বেকারি অপুষ্টি অসুখ-বিসুখে জর্জরিত তাদের জীবনে শান্তি কোথায়? যাদের নিরাপত্তা নেই আশ্রয় নেই কঠিন শ্রম করে যাঁরা কোনোমতে টিকে আছেন, তাঁদের জীবনে শান্তি একেবারেই নেই। কোনোকালে ছিল না। সুতরাং দুর্বল শ্রেণীর মানুষজনদের জন্য তৃণমূল স্তরে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন। জীবিকার্জন ও পরিবেশ সুরক্ষার কাজকর্ম তাঁদের জীবনে যে কিঞ্চিত শান্তি ও স্বস্তি দিতে পারে, তা দুর্বোধ্য নয়। নারী-জাতি সাধারণভাবে জীবনকে ভালবাসে, যুদ্ধ ও হিংসাকে তারা ঘৃণা করে। কারণ তারা মানবজাতির পুনর্বীকরণ ও শিশুকে স্তন্য দিয়ে বড় করে। পুরুষ মনস্তত্ত্বে আগ্রাসী মনোভাব, অহমিকা ও আধিপত্য করার প্রবণতা সম্ভবত সমধিক বেশি। তাই নারীকল্যাণ ও পরিবার, সমাজ ও প্রশাসনে তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা ও স্থান দেওয়া শান্তি ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের জন্য একান্ত আবশ্যক।

আবার সুখি সন্তুষ্টচিত্ত নিরাপত্তায় থাকা মানুষজন জীবনকে ভালবাসে, যুদ্ধে গিয়ে আহত বা নিহত হতে চায় না। যেখানে স্বল্প হলেও জীবিকার্জনের সহজলভ্য নানাপথ খোলা আছে। সেখানে খুব সহজে লক্ষ লক্ষ যুবক সামরিক বিভাগে নাম লেখাবে না। আর তারা না আসলে রাষ্ট্র বা সেনানায়কদের পক্ষে সমরাভিযান সম্ভবই নয়। তাই তৃণমূলস্তরে জীবন ও জীবিকার সুসংস্থান হলে, সমাজে শোষণ ও অত্যাচার না থাকলে পৃথিবীতে শান্তি স্থায়ী হবে। সমাজে দারিদ্র্য, বুভুক্ষা, বেকারি, নিপীড়ন না থাকলে কোনো রাষ্ট্র বা সমর বিভাগের পক্ষে যুদ্ধাভিযান সম্ভবই নয় তা সেই সেনানায়ক আলেকজান্ডার, হ্যানিবল, চেঙ্গিসখান, নেপোলিয়ান, হিটলারের মতো যত অত্যুজ্জ্বলই (Charismatic) হোন না কেন। পৃথিবীর বুদ্ধিমান বিবেকবান জীবনপিয়াসী মানুষদের কাছে নোবেল কমিটি হয়তো এইরকম বার্তাই পৌঁছে দিচ্ছেন তাঁদের শান্তি পুরস্কারের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়ে। গতবারও ইরানীয় আইনবিদ শিরিন এবাদি নারী ও শিশুকল্যাণের জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার এবং এবার সাহিত্যেও অস্ট্রিয়ান ভদ্রমহিলা নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

বিকল্প নোবেল : দুহাজার চার

দুহাজার চার সালের সুইডেনের রাইট লাইভলিহুড অ্যাওয়ার্ড, যা বিকল্প নোবেল পুরস্কার নামে সারা পৃথিবীতে সম্মানিত, প্রদত্ত হয়েছে গত ডিসেম্বরের সাত তারিখে বিখ্যাত নোবেল পুরস্কারের আগের দিন। 1980 সাল থেকে প্রতিবছরই স্টকহোমে বিখ্যাত নোবেল প্রাইজ যেখানে যেভাবে দেওয়া হয়, সেইভাবেই দেওয়া হচ্ছে। পুরস্কার কোনো ব্যক্তিকে নয়, তাদের সংগঠন বা কাজের জন্য দেওয়া হয়। কাউকে অর্থ দেওয়া হয়, কাউকে আবার শুধু সাম্মানিক মানপত্র দেওয়া হয়। পুরস্কারের আর্থিক মূল্য 220,000 মার্কিন ডলার প্রাপকদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।

এ পর্যন্ত পঞ্চাশটি দেশের 250টি মনোনয়নের মধ্যে ছত্রিশ জনকে পুরস্কার বা সম্মানিত করা হয়েছে। এবারে যে দুজন বিশিষ্ট ভারতীয় সমাজকর্মী পুরস্কার পাচ্ছেন তাঁরা হলেন হরিয়ানার হিন্দু ধর্মীয় সমাজকর্মী স্বামী অগ্নিবেশ ও বিশিষ্ট ইমালামী পণ্ডিত ও সমাজকর্মী আসগর আলি ইঞ্জিনিয়ার। এরা দুজনেই ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষজনদের ভিতর ধর্ম ও জাতপাত নির্বিশেষে সকলের মধ্যে সহযোগিতা, সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা করে গেছেন। তাঁরা দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সহযোগিতা, সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের জন্য প্রয়াস করে গেছেন। এবারে আরো যাঁরা পুরস্কৃত হয়েছেন তাঁদের বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া হল (বিশদ বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট দ্রষ্টব্য: www.rightlivelihood.org.

মেমোরিয়াল, মস্কো

মেমোরিয়ালের পুরো নাম হল International Volunteer Public Organisation Memorial Historical Educational, Human Rights and Charitable Society. 1980-র দশকের শেষদিকে বিভিন্ন স্মারক সমিতির সমন্বয়ে সংগঠনটির সৃষ্টি হয়। এটাই রাশিয়ার প্রথম বেসরকারি রাজনৈতিক এন জি ও, যার প্রথম সভাপতি ছিলেন আন্দ্রেই সাখারভ। বর্তমানে রাশিয়া ছাড়াও এতে ইউক্রেন, পোল্যান্ড, লাটাভিয়া জার্মানির কিছু সংগঠন আছে। পূর্বতন রাশিয়া ও পূর্ব ইওরোপের দেশসমূহের নাগরিক অধিকার, সুরক্ষা ও পূর্বেকার মানবাধিকার সংগঠনের তথ্য, পুস্তক ও প্রমাণাদি এঁরা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করছেন। অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্যে অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এরা কাজ করছেন। কাজ করতে গিয়ে কেউ কেউ নিহতও হয়েছেন। গুলাগ বন্দিদের সত্তর হাজার দলিল, তেইশ হাজার বই এবং নানাবিধ চিত্র ও নকশা এদের সংগ্রহে আছে। উত্তর-পশ্চিম উরাল পর্বতমালার পার্ম নগরীর সন্নিকটে শেষ সোভিয়েত কন্‌সেনট্রেশান ক্যাম্পের জায়গায় মেমোরিয়াল একটি মিউজিয়াম স্থাপন করেছেন। দাসশ্রম দেবার জন্য রাশিয়া থেকে যেসব রাজনৈতিক বন্দিদের (*Ostarbeitar*) জার্মানিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের চার লক্ষ চিঠি এদের সংগ্রহে আছে। রাজনৈতিক আতঙ্কের শিকার নামে কয়েকটি সিডি এরা প্রকাশ করেছেন। কুড়িটি উপজাতির যে তেরো লক্ষ মানুষ সোভিয়েত রাজত্বে নিহত হয়েছিলেন সেই সংখ্যা প্রকৃত সংখ্যার প্রায় দশ শতাংশ মাত্র। এই হিসাব করছেন মেমোরিয়াল মহাফেজখানার (archives) তথ্য ও প্রমাণ থেকে। এরা দেখেছেন যে, অন্তত পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষকে জোসেফ স্ট্যালিনের নিজস্ব আদেশে হত্যা করা হয়। এসবই তাদের প্রকাশিত তথ্য। সোভিয়েত আমলে ক্ষতিগ্রস্ত, আহত, নিহত ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারবর্গের ক্ষতিপূরণের জন্য এরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও গণ্ডগোলের তপ্তঅঞ্চলগুলিতে (যেমন, চেচনিয়া আজেরবাইজান, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, মোরাভিয়া, ক্রিমিয়া) যাতে মানবাধিকার লঙ্ঘন না হয় তার জন্যে এরা নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এদের ওয়েবসাইট : www.memo.ru।

বিয়াঙ্কা জ্যাগার নিকারাওয়া

মানবাধিকার সুরক্ষা সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং পরিবেশে সুরক্ষার কাজের জন্য বিয়াঙ্কা ব্যাগারকে এই পুরস্কার ও সম্মান দেওয়া হয়। এই মহিলা দেখিয়েছেন, কী করে স্বীয় পাণ্ডিত্য ও খ্যাতিকে সমাজের দুর্বল ও নিপীড়িত মানুষদের কল্যাণে সদ্ব্যবহার করা যায়।

রাউল মন্টোনিগ্রো আর্জেন্টিনা

নিবেদিত-প্রাণ বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও পরিবেশকর্মী মন্টেনিগ্রো পরিবেশ অবনমন হ্রাস ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নিরলস সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। তিনি আর্জেন্টিনার অধিবাসী ও স্থানীয় জনসাধারণের সাথে পরিবেশ সুরক্ষা ও প্রাকৃতিক সম্পদ সদ্ব্যবহারের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর কর্মকাণ্ডের প্রভাব দক্ষিণ আমেরিকার বাইরেও প্রসারিত।

রাইট লাইভলিহুড ফাউন্ডেশনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

এই সংস্থার উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠাতা জার্মানির ফিলাটেলিক এক্সপার্ট জ্যাকব ফন্ উয়েস্কাল। (Jacob von Uexkall) তিনি তাঁর সমগ্র সংগ্রহ বিক্রি করে ফাউন্ডেশনের প্রাথমিক তহবিল গঠন করেন। যদিও আলফ্রেড নোবেল বিগত বৎসরে মানবজাতির সর্বাধিক কল্যাণকারী ব্যক্তি ও তাঁদের কাজসমূহকে সাহায্য ও সম্পন্ন করার জন্যই নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তন করেন। বাস্তবে তা হয়ে উঠছে না বলে উয়েস্কালের ধারণা হয়। পৃথিবীতে, বিশেষ করে অনুন্নত বিশ্বের বহু মূল্যবান অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও কাজকর্ম বিখ্যাত নোবেল প্রাইজে প্রায় আসেই না, যা মানবজাতির পক্ষে একান্ত অপচয়। তিনি বলেন :

> সংশয় ও মতাদর্শের নৈরাজ্যের একবিশ্বে আজ আমরা আছি। যে সব সমস্যার আমরা আজ সম্মুখীন, তাদর বাস্তব ও নির্ভরযোগ্য সমাধানের উপায় খুবই কম। এই পুরস্কার সেইসব কাজের জন্য ... হবে উপভোগ্য সুন্দর নতুন নতুন এক বিশ্বের ভিত্তি।

বহুলোকেই মনে করেন নোবেল পুরস্কারের মাধ্যমে আলফ্রেড নোবেলের আশা ও স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

প্রকাশিত বহু সংবাদ ও পুস্তকাদির তথ্যাদি নোবেল প্রাইজ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জাগায়। নোবেল প্রাইজ পাওয়া বহু কাজ যেমন নিঃসন্দেহে মানুষের অশেষ কল্যাণ করেছে, অনেকগুলি আবার মানুষের ক্ষতি ও দুর্গতিতেও ব্যবহৃত হয়েছে। অনেক কাজ সমর শিল্পগোষ্ঠীদের ধ্বংসক্ষমতা বাড়িয়েছে, অথবা পুঁজিপতি বা বহুজাতিক সংস্থাগুলির মুনাফা ও শক্তিবৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। রাইট লাইভালিহুড ফাউন্ডেশনের আদর্শমন্ত্র হল মহাত্মা গান্ধির একটি কথা: The world has enough for every ones need, but not for only one's greed.

এই ফাউন্ডেশনটি সুইডেনে রেজেস্ট্রিকৃত একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান, যাতে সমগ্র পৃথিবী থেকেই বিশিষ্ট আদর্শবান জ্ঞানী মানুষজন আছেন। জুরি বোর্ডে দুজন ভারতীয়র নাম দেখা যাচ্ছে। একজন ভারতীয়, অন্যজন সম্ভবত অনাবাসী মার্কিন। বিলি রাজন, ডেকান ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা; অনুরাধা মিত্তাল, আমেকিার ইনস্টিটিউট ফর ফুড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পলিসির প্রাক্তন ডাইরেকটর।

ফাউন্ডেশন মনে করে, উন্নত পাশ্চাত্য দুনিয়ার প্রবণতাই হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে তাদের মতো তৈরি / উন্নত করে সাময়িক উন্নতিও বিলাসবহুল জীবনের জন্য ধরিত্রীর বহুযুগের সঞ্চিত সম্পদের দ্রুত অবক্ষয় বা অপচয়। এর বিষময় পরিণতি হল আগামীদিনের সর্বনাশা জটিল সংকটাবর্ত, এমনকী সম্ভাব্য সামগ্রিক ধ্বংসও। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রচলিত সামাজিক ভিত্তি ও জীবনাদর্শকে প্রশ্ন করে বিতর্কসৃষ্টি করাতে তাঁরা আগ্রহী। তাঁরা দেখছেন এখন আমরা এখন একটা পৃথিবীতে আছি। যেখানে উৎপাদন ও সেবার (producing and services) কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রচণ্ড বাড়বাড়ন্ত, প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। আবার অন্যান্য বহুক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উৎপাদন ও সেবার নিতান্ত অভাব। 'ইন্‌ফরমেশনে (তথ্য) ঘটছে প্রায় বিস্ফোরণ, জ্ঞান (নলেজ) প্রতি দু-বছরে এখন প্রায় দ্বিগুণিত হচ্ছে। ধনবান, বিত্ত ও শক্তিশালী শ্রেণী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সেইদিকেই বাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, যেখানে তাঁদের আধিপত্য আরাম ও ভোগবিলাস সুনিশ্চিত হয়। অবহেলিত থাকছে অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীর বিপুল মানুষদের প্রয়োজন। এইরকম বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে ফাউন্ডেশন মনে করে। কেমন করে, কিভাবে (How to)? আগে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে, 'কি জন্যে' (What for)? যেখানে জ্ঞান ও তথ্য (knowledge and information) লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, সেখানে ঠিক করতে হবে কোন্ কাজ। কোন্ ব্যক্তিকে আমরা সম্মানিত বা পৃষ্ঠপোষকতা করব কোন্‌টাকে করব না। এ-প্রসঙ্গে গুনার মিরদালের মন্তব্য সবিশেষ উল্লেখ্য :

> সমাজের পিছনেই থাকে কিছু গোষ্ঠীস্বার্থ, কিছু মূল্যবোধ। নিঃস্বার্থ জ্ঞানচর্চা, নিরাসক্ত গবেষণা কখনো ছিল না, কখনো হবেও না। উত্তর বা সমাধান সন্ধানের আগে প্রশ্ন থাকতে হবে। দর্শনের অবস্থান বা দৃষ্টিভঙ্গি (viewpoint) ছাড়া কোনো দর্শন (view) হতে পারে না। প্রশ্নের ভিতরেই থাকে প্রশ্নকর্তার দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ।

ভারত ও বিকল্প নোবেল

বিকল্প নোবেল বিজয়ী ভারতীয়দের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

এক. **ইলা ভাট**: Self Employed Women's Association (1984)
পরিবারভিত্তিক উৎপাদন সংগঠন ও উৎপাদন-কারিনীদের উন্নত জীবনযাত্রায় সহয়াতার জন্যে।

দুই. **রজনী কোঠারি** : লোকায়ন (1985)
নাগরিক অধিকার সুরক্ষা, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা ও পরিবেশ সুরক্ষার ছোট ছোট সংগঠনগুলিকে যুক্ত ও শক্তিশালী করার জন্য।

তিন. **লাদাখ পরিবেশ উন্নয়ন সংগঠন** (1987)

চার. **সুন্দরলাল বহুগুণা** : চিপ্‌কো অন্দোলন (1987)
ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ, উজ্জীবন এবং সুপরিবেশীয় ব্যবহারের অন্দোলনের জন্য।

পাঁচ. **মেধা পাটকার** : নর্মদা বাঁচাও অন্দোলন (1991)

ছয়. **বন্দনা শিবা** (1993)
বর্তমানের উন্নয়নের ধারার মর্মস্থানে নারী ও পরিবেশকে যথাযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

সাত. **হনুমাপ্পা সুদর্শন** : বিবেকানন্দ গিরিজন কল্যাণ কেন্দ্র (1994)
উপজাতি জীবনধারা ও সংস্কৃতি কিভাবে

আদিবাসীদের অধিকার ও প্রয়োজন মেটায় ও পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখে, তা তুলে ধরার জন্য।

আট. **কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ** : কেরালার জনবিজ্ঞান আন্দোলন (1996)

নয়. **স্বামী অগ্নিবেশ** : হিন্দু সমাজ সংস্কারক (2004) ভেপা শ্যাম রাও-এর জন্ম ছত্তীসগঢ়ে 1939 সালে। 1970 সালে তিনি সন্ন্যাসী হিসাবে স্বামী অগ্নিবেশ নাম গ্রহণ করেন। বৈদিক সাম্যবাদের ভিত্তিতে দেশ ও রাজনীতির পুনর্গঠনের জন্য তিনি হিন্দু সন্ন্যাসী হন ও আর্যসভা নামে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। *বৈদিক সমাজবাদ* নামে একটি গ্রন্থও তিনি প্রণয়ন করেন(1974) । ইন্দিরা গান্ধির জরুরি অবস্থার বিরোধিতা করে তিনি চোদ্দো মাস কারাবরণ করেন। জরুরি অবস্থার অবসানে ভোটে জিতে তিনি হরিয়ানা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং শিক্ষামন্ত্রী নির্বাচিত হন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি প্রচলিত রাজনীতি ও তৎসংশ্লিষ্ট কাজকর্মের প্রতি মোহমুক্ত ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে মন্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করেন।

1981 সালে 'বন্ধুয়া মুক্তি মোর্চা' প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীন ভারতে দাসত্বে বাঁধা 1,72,000 জন শিশুসহ দাসশ্রমিকদের মুক্তির ব্যবস্থা করেন। নিজেদের বা পিতামাতার দেনার দায়ে এরা দাসত্বে বাঁধা ছিল। ইটখোলা, পাথর খাদান ও নির্মাণের নানা কার্যে কঠিন কাজের শর্তে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আনা আদিবাসীদের দিয়েই নানা কাজ করানো হতো। স্বামী অগ্নিবেশ এদের কাজের শর্ত ও পরিবেশকে কিছুটা মানবিক করতে সক্ষম হন। তিনি লোকসভার সদস্যও হন এবং আন্তর্জাতিক স্তরে কাজ করার সূত্রে তিনি তিনবার রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমকালীন দাসত্ব অবসান ট্রাস্ট তহবিলের প্রধান নির্বাচিত হন। ভারতে অস্পৃশ্যতা ও সতীদাহ নিবারণ এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য অনেক আন্দোলন করেছেন। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনেও তিনি কাজ করেন। তিনি পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক অভিযানে (Western Cultural Invasion), বিশ্বব্যাঙ্ক ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার ঘোর বিরোধী।

দশ. **আসগর আলি ইঞ্জিনিয়ার** : দক্ষিণ এশিয়ায় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য কাজ করেন (2004)

একজন বিশিষ্ট ইসলামী পণ্ডিত। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে সুসম্পর্কের জন্য ও সামগ্রিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। মুম্বাইতে Centre for Study of Society and Secularism (CSSS), যা তিনি প্রতিষ্ঠা করেন (1995), তিনি তার চেয়ারপার্সন। তাঁর লিখিত সাতচল্লিশটি বই প্রকাশিত হয়েছে। তিনি একটি পত্রিকা (*Journal for Secularism*) ও মাসিক পত্রিকা (*Islam and Modern Age*) নিয়মিত প্রকাশ করেন।

সামাজিক ও পরিবেশীয় কাজকর্ম ও পশ্চিমবঙ্গের আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতি

পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র পূর্বাঞ্চলেই সামাজিক নারীকল্যাণ ও পরিবেশ উন্নয়নের কাজকর্মের এমনই মন্দাবস্থা যে বহুদিন ধরেই এতদাঞ্চলের কোনো সৃজনশীল বা গঠনমূলক কাজকর্মের কোনো আন্দোলন বা ব্যক্তিত্ব দেখা যায় না, যা আন্তর্জাতিক, এমনকী সর্বভারতীয় স্তরেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য বা অভিনন্দিত হচ্ছে। অথচ স্বদেশী আমলে বাংলায় সৃজনশীল ও গঠনমূলক কাজকর্ম অনেক হয়েছে। অমর্ত্য সেন বা মহাশ্বেতা দেবী হয়তো তার ব্যতিক্রম। অমর্ত্য সেন যদি ইউরো-আমেরিকার অনুপ্রেরণায় অনুকুল পরিবেশ ও কাজকর্মের সুযোগ সুবিধা না পেতেন, তিনি যদি ইংল্যান্ডে না থেকে পশ্চিমবঙ্গের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতেন তবে তিনি নোবেল পুরস্কার পেতেন কিনা সন্দেহ। এখানে ভালো গঠনমূলক বা সৃজনশীল কাজকর্ম করার যোগ্যতা বা মানসিকতা কারো নেই, এমন নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু শুধু সুপরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধার অভাবমাত্রই নয়, বহুক্ষেত্রে অহেতুক অপ্রয়োজনীয় প্রতিকুলতা সৃষ্টি হওয়ায় এই অঞ্চলে কেউই বিশেষ কিছু করে উঠতে পারছেন না। গত কয়েকদশকের তথ্যই তার প্রমাণ। □

আন্টার্কটিকা

অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আমেরিকা জনবসতির সীমানা ছাড়িয়ে দক্ষিণ মেরুর চারপাশে অসমবিস্তৃত বিশাল যে ভূখণ্ড ভূপৃষ্ঠের প্রায় এক পঞ্চমাংশ —প্রায় 54 লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে অবস্থিত, তাই হল বিস্ময় ও রহস্যেঘেরা আন্টার্কটিকা মহাদেশ। আন্টার্কটিকা শ্বেত তুষারাবৃত সমুদ্র (বরফের আস্তরণের গড় গভীরতা এক মাইলের ও বেশি) আর সদাগর্জনী ঝড়ের মহাদেশ। অন্ধকার গর্জনমুখর রাত্রি এখানে একটানা ছয় মাস স্থায়ী, তাপমাত্রা বিশ্বের শীতলতম, বরফের গলনাঙ্কেরও প্রায় 90 ডিগ্রি সেলসিয়াস নীচে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে শৈত্যময় দীর্ঘ রাত্রির অবসানে সূর্যোদয় ঘটে, বসন্ত উঁকি মারে, ঘূর্ণিঝড়ের প্রাবল্য কমে, তাপমাত্রা বাড়তে থাকে, ক্রমে তা ওঠে 10-11 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলের আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর আন্টার্কটিকার প্রভাব পড়ে।

এহেন আন্টার্কটিকা কিন্তু জীবশূন্য নয়। সাগর-প্রান্তবর্তী ভূমি এবং পাহাড়ে অল্প কিছু প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ এবং শেওলা-ছত্রাকের মিথোজীবী রূপ (licheus) দেখা যায়। তবে এখানকার সমুদ্র পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম জীবসমৃদ্ধ বাস্তুসংস্থান। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন থেকে বৃহত্তম তিমিদের রাজত্ব এখানে। তাছাড়া এখানকার সিল, পেঙ্গুইন ও ক্রিল (Krill —চিংড়ি মাছের মতো) তো পৃথিবীবিখ্যাত। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে এখানে প্রচুর ধাতব খনিজ এবং জ্বালানি তেলের সন্ধান মিলেছে। মাছের বৈচিত্র্যও কম নয়। ট্যুরিজমের সম্ভাবনা অপরিসীম।

আন্টার্কটিকার মতো জনমানবশূন্য দুর্গম হিমরাজ্যও দূষণমুক্ত নয়। অত্যন্ত স্থায়ী ক্লোরোফ্লুরোকার্বন (CFC) জাতীয় যৌগ জমেছে প্রচুর আন্টার্কটিকার উপরের আকাশে। এবং এরাই আন্টার্কটিকার 'বসন্তকালীন ওজোন ছিদ্রের জন্য দায়ী। তিমি, সিল ও ক্রিল শিকারীদের আনাগোনা অনেকদিন ধরেই চলছে। পেঙ্গুইন, সিল ও তিমির কিছু কিছু প্রজাতি ইতিমধ্যেই অবলুপ্ত। টুরিস্টদের সংখ্যা বাড়ছে। জাহাজ থেকে তেল পড়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে। 1989-তে আর্জেন্টিনার ভ্রমণার্থী ও তৈলবাহী জাহাজ থেকে এক লক্ষ সত্তর হাজার গ্যালন ডিজেল পড়ে গেছে আন্টার্কটিক সমুদ্রে। প্রত্যন্ত অঞ্চলেও মনুষ্যকৃত নানারকম দূষণের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

দক্ষিণ মেরু মহাদেশ আন্টার্কটিকায় মনুষ্যবসতি নেই, কাজেই কোনো সরকার বা প্রশাসনও নেই, অথচ আছে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ। জাতিপুঞ্জে (UN) এই মহাদেশের কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই। কাজেই এ যেন এমন এক ভূভাগ যার দখলিসত্ব যে কেউ দাবি করতে পারে। বস্তুত সাতটি দেশের পক্ষ থেকে আন্টার্কটিকার বিভিন্ন অঞ্চলের স্বত্বের দাবি উঠেছিল।

এই সাতটি দেশ হল আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, চিলি, ফ্রান্স, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে এবং ইংলন্ড। আমেরিকা এবং পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়া প্রত্যক্ষ দাবি না জানালেও, ওই মহাদেশে অভিযান ও গবেষণায় তারাও সক্রিয় ছিল এবং তাদের আগ্রহও কম ছিল না। 1957-58 সালে আন্তর্জাতিক ভূপদার্থবিজ্ঞান বর্ষ (International Geophysical Year, IGY) উপলক্ষ্যে অনেকগুলি দেশের বিজ্ঞানীরা আন্টার্কটিকায় সমবেত হন।

উপরি উক্ত নটি দেশের সঙ্গে যুক্ত হন আরও তিনটি দেশের বিজ্ঞানী প্রতিনিধিরা। এই তিনটি দেশ হল বেলজিয়াম, জাপান ও দক্ষিণ আফ্রিকা। এই বারোটি দেশের আলোচনার মধ্য দিয়ে রূপ নেওয়া 'আন্টার্কটিক ট্রিটি', 1961-র জুন থেকে বলবৎ হয়ে এখনও পর্যন্ত তা আন্টার্কটিকার ভাগ্য নির্ধারণ করে চলেছে।

আন্টার্কটিক ট্রিটি অনেক দিক থেকেই একটি অনন্য ও বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক চুক্তি। এতে বলা হয়েছে, আন্টার্কটিকার ব্যাপারে সব দেশেরই সমান স্বার্থ ও আগ্রহ। এখানকার অঞ্চল বিশেষের উপরে তোলা/স্বত্বের দাবি চুক্তিতে স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় নি, তবে নতুন করে এরকম দাবি তোলা যাবে না বলে ঘোষণা করেছে। এই চুক্তি ঘোষণা করেছে যে, আন্টার্কটিকায় কোনো সামরিক ঘাঁটি বা ক্রিয়াকলাপ চলবে না, নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ ঘটানো যাবে না, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য

ফেলা চলবে না। মহাদেশ জুড়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা অব্যাহত থাকবে। বর্তমানে আন্টার্কটিকায় চার হাজারেরও বেশি সংখ্যক গবেষণাগার থেকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে।

ঘোষিত ব্যবস্থায় পরিবর্তন শুধু চুক্তিস্বাক্ষরকারী বারোটি দেশের সহমতের ভিত্তিতেই হতে পারবে। এই বারোটি ট্রিটি পার্টির সঙ্গে চুক্তির সমস্ত শর্ত মেনে যোগ দিয়েছে আরও বারোটি দেশ চুক্তিতে এদের চিহ্নিত করা হয়েছে কনসালটেটিভ পার্টি হিসেবে। আন্টার্কটিকায় প্রত্যক্ষ গবেষণাকর্মে এরা যোগ দিতে পারবে। ভারত এই দলে। এর বাইরেও অন্য দেশের অংশগ্রহণের সংস্থানও আছে চুক্তিতে, তারা গবেষণায় অংশগ্রহণ না করেও আন্টার্কটিক চুক্তির, অ্যাকসিডিং (acceding) পার্টি হিসেবে গণ্য হবে।

চুক্তির সূত্রেই 1982-তে বহুপক্ষীয় (multilateral) আইন হয়, যার পোশাকি নাম—'কনভেনশন অন কনজারভেশন অফ মেরিন লিভিং রিসোর্সেস'; 1988-তে গৃহীত হয় আরও একটি —দ্য কনভেনশন অন রেগুলেশন অফআন্টার্কটিক — মিনারেল রিসোর্স অ্যাকিজিটজ; 1991-তে স্বাক্ষরিত হয় প্রোটোকল অন এঁনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন—যার দ্বারা আগামী 50 বছর আন্টার্কটিকায় খনিজ উত্তোলন ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ করা হয়।

এইসব চুক্তি, কনভেনশন, প্রোটোকল কতদিন আন্টার্কটিকাকে সংরক্ষিত, সুরক্ষিত রাখতে পারবে বলা কঠিন। ট্রিটি পার্টির অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি দেশ, যেমন আমেরিকা মেনে নেয়নি যে কোনোদিন কোনো স্বত্ব-দাবি তারা করবে না। অস্ট্রেলিয়া ও ফ্রান্স 1988-র কনভেনশনের পরেই আন্টার্কটিকাকে আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক অঞ্চল (Wildness) ঘোষণার দাবি তোলে।

আবার পরে কোনো কোনো দেশের তরফে একে আন্তর্জাতিক পার্ক বলে ঘোষণার কথা বলা হয়। জাতিপুঞ্জের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই আন্টার্কটিকার উপর। তবে জাতিপুঞ্জে ও তার অধীনস্থ নানা সংস্থায় আন্টার্কটিকার ব্যাপারে আলোচনা উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে অনেকবার। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দ্য কনজারভেশন অফ নেচার অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস (IUCN) জাতিপুঞ্জের একটি সংস্থা 1991-তে আন্টার্কটিকার সুরক্ষা দেবার প্রয়াস পেয়েছে। এখন দেখার পৃথিবীর তাবৎ মানুষের স্বার্থ ও আগ্রহের আন্টার্কটিকা ভবিষ্যতে কেমন থাকে।

রবীন মজুমদার

ওজোন হোল ও মেরুপ্রদেশের জীবাণু

মাধব চট্টোপাধ্যায়

মাটি থেকে 10 কিলোমিটার ওপর পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুমণ্ডলের যে অংশটুকু আমাদের ঘিরে রেখেছে তার নাম ট্রোপোস্ফিয়ার। এর পরের অংশটি 50 কিলোমিটার ওপর পর্যন্ত বিস্তৃত, তার নাম স্ট্রাটোস্ফিয়ার। এখানেই আছে ওজোন গ্যাসের সেই আস্তরণ যা সূর্য থেকে আসা অতিবেগুনি রশ্মির (UV-ray) অনেকটাই শুষে নেয়। অতিবেগুনি রশ্মির 240nm থেকে 320nm তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অংশটুকু জীবজগতের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। মানুষের চামড়ায় ক্যান্সার হতে পারে এই রশ্মির প্রভাবে। ব্যাকটিরিয়ার মতো এককোষী জীবাণুদের ধ্বংস করে ফেলতে পারে এই রশ্মি।

সত্তরের দশকে দক্ষিণ মেরুর ওপরের স্ট্রাটোস্ফিয়ার অঞ্চলে ওজোনের ঘাটতি ধরা পড়ে। তারপর নানারকমভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে জানা গেছে যে, দক্ষিণ মেরুর ওপররের বায়ুমণ্ডলে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ওজোন গ্যাসের ঘনত্ব হ্রাস পেয়েছে। এই কম ঘনত্বের অঞ্চলটিকেই ওজোন হোল (Ozone Hole) বলা হয়। তথাকথিত এই গর্তের মাত্রাটা বেশ বড়সড়। একবার দেখা গিয়েছিল এর গভীরতা এভারেস্ট পর্বত শৃঙ্গকেও হার মানায় আর সমস্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঢুকে যেতে পারে এর মধ্যে। বায়ুমণ্ডলে ওজোনের এই ঘনত্ব কমে যাওয়ার ব্যাপরটা উত্তর মেরুতেও লক্ষ্য করা গেছে। তবে বিভিন্ন কারণে এখানে ওজোন ক্ষয়ের মাত্রাটা কম। কিছু কিছু শিল্পজাত দ্রব্য ওজোন নষ্ট করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্লোরোফ্লুরোকার্বন (CFC) জাতীয় যৌগ যা রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশন এবং বিভিন্ন ধরণের স্প্রের মধ্যে থাকে। বায়ুমণ্ডলে ওজোন স্তরের ক্ষয় বন্ধ করার জন্য এই জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা চলছে।

উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর হিমশীতল পরিবেশেও বিভিন্ন ধরণের প্রাণী বেঁচে থাকে। উত্তর মেরুর ভল্লুক আর দক্ষিণ মেরুর পেঙ্গুইনের কথা তো সকলেই জানে। তাছাড়া মেরুপ্রদেশের মাটি ও জলে নানারকম জীবাণু থাকে। দক্ষিণ মেরু থেকে আনা মাটি বিশ্লেষণ করে নানারকম ব্যাকটিরিয়া পাওয়া গেছে। আমাদের দেশে হায়দ্রাবাদের Centre for Cellular and Molecular Biology-তে দক্ষিণ মেরুর মাটি থেকে পাওয়া ব্যাকটিরিয়াদের নিয়ে গবেষণা চলছে। দেখা গেছে, উষ্ণ আবহাওয়ায় আমরা যে সব ব্যাকটিরিয়া পাই তাদেরই কারও কারও জাতভাইরা থাকে ওখানে। তফাৎ শুধু

একটাই। ওরা ঠাণ্ডায় বেঁচে থাকতে পারে আর এরা সেটা পারে না। আবার এমন কিছু কিছু ব্যাকটিরিয়া দক্ষিণ মেরুর মাটিতে পাওয়া গেছে, আগে যাদের অস্তিত্ব জানা ছিল না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এদের নিয়ে বিজ্ঞানীদের এত মাথাব্যথা কেন? এর কারণ একাধিক। প্রথমত জীবন বিজ্ঞানে যে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর আজও পাওয়া যায় নি তার একটি হলো চরমভাবাপন্ন পরিবেশে (উষ্ণ প্রস্রবণ, বরফে ঢাকা পাহাড় বা মহাসাগরের তলদেশ যেখানে জলের প্রচণ্ড চাপ) প্রাণের অস্তিত্ব কিভাবে সম্ভব? দক্ষিণ মেরুর ব্যাকটিরিয়াকে মডেল করে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন বিজ্ঞানীরা। এই গবেষণা থেকে যে যে তথ্য পাওয়া যাবে তা বিভিন্নরকমভাবে কাজে লাগতে পারে। যেমন সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহ বা উপগ্রহেরর (মঙ্গল গ্রহ বা ইওরোপ) হিমশীতল পরিবেশে প্রাণের অস্তিত্ব নিয়ে যে গবেষণা চলছে সেই গবেষণাকে সাহায্য করতে পারে দক্ষিণ মেরুর ব্যাকটিরিয়ার ওপর গবেষণালব্ধ তথ্য। তা ছাড়া যে সব মারাত্মক রোগজীবাণু রেফ্রিজারেটারের মধ্যে রাখা খাবারে বেঁচে থাকতে পারে তাদের বাঁচার কলাকৌশলগুলো হয় তো বোঝা সম্ভব হতে পারে এইসব গবেষণা থেকে এবং ওদের কবজা করার দু-একটা উপায়ও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। দক্ষিণ মেরুর ব্যাকটিরিয়া থেকে কিছু উৎসেচক পাওয়া গেছে যেগুলো ঠাণ্ডাতেও সক্রিয় থাকে। কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করার কাজে, বিভিন্ন শিল্পজাত খাদ্যদ্রব্যের প্রস্তুতিতে, সিয়াচিন এবং মেরুপ্রদেশের মতো ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় জমে থাকা আবর্জনা পরিষ্কার করার কাজে এবং জীবন-বিজ্ঞানের গবেষণায় এদের মূল্য অপরিসীম।

ওজোন হোলের মধ্যে দিয়ে যে পরিমাণ বাড়তি অতিবেগুনি রশ্মি মেরুপ্রদেশে পৌঁছোচ্ছে ওখানকার জীবজগতের ওপর তার প্রভাব নিয়ে বিজ্ঞানীরা চিন্তিত। ওখানে যেসব জীবাণু আছে তারা কি ধ্বংস হয়ে যাবে এই রশ্মির প্রভাবে? এ প্রশ্ন নাড়া দিয়েছে বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজকে। এ-ব্যাপারে কিছু কিছু পরীক্ষা -নিরীক্ষা হয়েছে। দেখা গেছে অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে দক্ষিণ মেরুর কিছু কিছু উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। তবে সম্প্রতি এ ব্যাপারে কিছু আশার বাণী শুনিয়েছেন একদল বিজ্ঞানী। বিশ্বের তিনটি নামকরা প্রতিষ্ঠানের (British Antarctic Survey, German Aerospace Centre এবং Marine Physical Laboratory US) সম্মিলিত গবেষণায় দেখা গেছে যে, মেরুপ্রদেশে এমন সব জায়গা আছে (বরফ, মাটি বা পাথরের আস্তরণ) যার ভেতর থাকলে জীবাণুরা অতিবেগুনি রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব এড়িয়ে চলতে পারে। এই গবেষণার কাজে তাঁরা *Bacillus subtilis* নামে একটি ব্যাকটিরিয়াকে মডেল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। 2000 সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ মেরুতে এবং জুলাই মাসে উত্তর মেরুতে বিভিন্ন জায়গায় ধুলো, পাথরের গুঁড়ো, বরফের আস্তরণ এবং অন্যান্য জীবাণুদের আস্তরণের তলায় *Bacillus subtilis*-এর এক নমুনা রেখে কোনো কোনো ক্ষেত্রে 24 ঘণ্টা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কয়েক দিন বাদে ওই নমুনা বার করে তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেন, আগের তুলনায় ব্যাকটিরিয়াগুলোর শতকরা কত অংশ বংশবৃদ্ধি করার ক্ষমতা হারিয়েছে। পাশাপাশি তাঁরা ওই একই ব্যাকটিরিয়ার আর একটি নমুনা খোলা জায়গায় রেখে ওই একই পদ্ধতিতে পরীক্ষা করেন। বলা বাহুল্য যেসব ব্যাকটিরিয়া খোলা জায়গায় রাখা ছিল প্রতি ক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্তদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। গ্রীষ্মকালে মেরু প্রদেশে সূর্যালোকে যে অতিবেগুনি রশ্মি থাকে তা সরাসরি এসে পড়েছিল তাদের ওপর। অন্যদিকে যারা বরফ, পাথর, ধুলো বা অন্যান্য জীবাণুদের আস্তরণের নীচে ছিল তাদের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাকটিরিয়ার সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে কম। সুতরাং মেরুপ্রদেশে জীবানুরা যদি এইসব নিরাপদ জায়গার নীচে আশ্রয় পায় তাহলে তারা অতিবেগুনি রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব অন্তত কিছুটা এড়িয়ে চলতে পারে। এখানে উল্লেখযোগ্য অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাব থেকে কোষকে বাচাবার জন্য কিছু কিছু ব্যাকটিরিয়া কোষে বিশেষ ধরণের রাসায়নিক দ্রব্য (যেমন carotenoida জাতীয় যৌগ) তৈরি হয়। আবার কোনো কোনো ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে থাকে সক্রিয় কিছু উৎসেচক যারা অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে কোষের DNA র ক্ষতি হলেই চটপট তা মেরামত করে দেয়। এসব তথ্য আগেই জানা ছিল। যে গবেষণা নিয়ে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হল তা এ-ব্যাপারে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করতে পারে। প্রকৃতির নিজস্ব গবেষণাগারের এইসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যবস্থা সত্যিই বিস্ময়কর।

ত থ্য সূ ত্র

Measurement of microbal piotection from ultraviolet radiation in polar terrestrial microhabitats
Cockell C, Rettberg P. Horneck G. Scherer K, Dale Stokes M, *Polar Biology*, (2003) Vol 26, pp 62-69.

তিন জুলাই দুহাজার চার-এর আলোচনা-মতামত

উনিশশো সাতাত্তর থেকে দুহাজর চার। প্রায় সাতাশ বছর। একটা জীবনের পক্ষে সময়টা নেহাৎ কম নয়। সেদিনের তিরিশ মধ্য-তিরিশের যারা *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী* নামের পত্রিকাটির উদ্যোক্তা ছিলেন আজ তাঁদের অনেকেরই ছায়া পুবে হেলেছে। বেড়েছে *বিওবি*-র বয়সও। বেড়েছে নিয়ম মেনেই। কিন্তু তার প্রকাশ বন্ধ হয় নি কোনও ভাবে। নানা সামাজিক, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক টানাপোড়েন, উত্থান-পতন, খানাখন্দ পেরিয়ে এই একুশ শতকের প্রথম দশকে সে খানিকটা শীর্ণকায়। তবে এটাই শেষ কথা নয়। ব্যক্তি জীবন শেষ হলেও সমষ্টি জীবনপ্রবাহ চলতে থাকে। এটাই নিয়ম। হয়তো এই প্রবাহে কখনও কখনও পরিবর্তন ঘটে, অভিযোজন ঘটে। *বিওবি* পঁচিশ বছর একটানা চলেছে—এটাও যেমন সত্যি, তেমনি বিপরীত দিকে সময়ের সঙ্গে তালমিলিয়ে মানিয়ে নেওয়াটা হয়তো তার উপযুক্তভাবে হয়নি। তাই সংকুচিত হতে হয়েছে তাকে নানাভাবে, নানা দিক থেকে। কলেবরে, সময়ে, অর্থে কিংবা সক্রিয় কর্মী সংখ্যায়। হাজারো কারণ থাকতে পারে তার। সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভাটার দোহাই পেড়ে অনেক ব্যাখ্যাও হয়তো দেওয়া যেতে পারে। তবুও মূল প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়া যাচ্ছে না কোনওভাবেই —তবে কি *বিওবি*-র প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে? সমাজ-সংস্কৃতিতে তার কোনও অবদানই কী আর গ্রাহ্য নয়। বর্তমান-ভবিষ্যৎ কিছুই কি *বিওবি*-র রইল না আর? বর্তমানের এই অনিয়মিত প্রকাশ কি তাহলে শুধুই উদ্যোক্তাদের আত্মতুষ্টি মাত্র? মনকে চোখ ঠেরে এসব প্রশ্নের দায়-এড়ানোর কথা মানতে চাইছেন না কেউ কেউ। তাই, শুরুর দিকের সক্রিয় কর্মী, যাঁরা এখনও পত্রিকার হাঁড়ি ঠেলার কাজটি মানে কুলিগিরি, টাকা জোটানো, কাগজ কেনা, লেখা জোগাড়, সম্পাদনা, ছাপাছাপি, দোকানদারি আর পাঠকের হাতে পরিবেশন পর্যন্ত সমস্ত দায় সামলাচ্ছিলেন তাঁদের কাছে হয়ে উঠেছিল যন্ত্রণার। এবং তার থেকে জন্ম নিচ্ছিল খানিকটা হতাশাও। তবুও ভেঙে পড়তে চাইছেন না তাঁরা। তাই এসব ভাবনাচিন্তার মধ্যে থেকে এই কঠিন সময়েও তাঁরা পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক, ত্রিপাক্ষিক কথাবার্তায় আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিলেন কোনও নতুন দিশার খোঁজে। আর তারই পরিণতি তিন জুলাই দুহাজার চার-এর আলোচনাসভা। সামান্য একটু

বন্ধুর পথে দাঁড়ায়ো বন্ধু জীবনে মোর !

আমি *বিওবি* অর্থাৎ *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী* বলছি। তুমি, তোমরা তো জানো, যৌবনেই আমি জরাগ্রস্ত, এখন কি উপায়? আমার জন্য কণামাত্র অনুভূতি যদি আজও কোথাও জেগে থাকে তাহলে এসো না একদিন— সামনের তেসরা জুলাই, দুহাজার চার শনিবার, দুপুর বারোটায় রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রিতে। সবাই মিলে শলা করে কিছু একটা করো আমার জন্য।

কানাঘুষো যা শুনি, আমার তিনটি গতি সম্ভব—

—করুণা-হত্যা অর্থাৎ মার্সি কিলিং

—এইতো বেশ চলছে, আর

—নবজীবন পেলে ভালোই তো, কিন্তু ....

না, শুধু মতামত দিয়েই ক্ষান্ত থেক না। লিখিতভাবে বলার চেষ্টা কর— কিভাবে কি করা সম্ভব। আমার থাকার জায়গা, ওষুধ-পথ্য, সেবা-শুশ্রূষা। বেঁচে থেকে (যদি চাও) কি হবে, কোত্থেকে কিভাবে রসদ আসবে সবই ভেব। প্রোজেক্ট না কি কর তোমরা—তারই মতো প্ল্যান দাও।

জানি আমার কথার মধ্যে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা উঁকি মারছে। কি করি বল, কে আর মরতে চায়? পৃথিবী কি একেবারেই রূপ-রস-গন্ধহীন, জীবনহীন সংগ্রামহীন নিঃস্ব হয়ে গেছে? মায়াও লাগে কয়েকটা আপোগণ্ডের জন্য। এস কিন্তু, পারলে অন্য বন্ধুদেরও সঙ্গে এনো।

বিওবি, 7 এপ্রিল, 2004।

বড় করে অর্থাৎ যাঁরা একসময়ে সহযোগী সহমর্মী ছিলেন বা আছেন কিংবা যাঁরা কোনও না কোনও সময়ে কোনও-না কোনওভাবে কাজেকর্মে জড়িয়ে ছিলেন বা আছেন তাঁদের সকলকে জড়ো করে বসেছিল ওই আলোচনাসভা। হাতে লেখা একটা চিঠি জেরক্স করে পাঠানো হয়েছিল অনেককেই। তবুও সবাই হয়তো শেষপর্যন্ত সেটা হাতে পাননি বা পেলেও সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর পেয়েছেন। যাই হোক, আলোচনাসভার স্থান ছিল রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি হল। সময় ঠিক করে নেওয়া হয়েছিল দুপুর বারোটা।

সভায় যাঁরা এসেছিলেন :

কলকাতা থেকে : বিপ্লব শিকদার, তরুণ বসু, শিবপ্রসাদ নিয়োগী, ভাস্কর ব্যানার্জি, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু দাশগুপ্ত, রবীন ব্যানার্জি, সুভাষ গাঙ্গুলি, কল্যাণ মৈত্র, দোলা সেন, রেখা ব্যানার্জি, ওমপ্রকাশ চক্রবর্তী, স্বপন দাস, সুমিত ঘোষ, উত্তান বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন ভদ্র, অমিত চৌধুরী, রবীন চক্রবর্তী, কুমারেশ মিত্র, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাই চক্রবর্তী, নিলয় রায়, গুড্ডি, শান্তনু ত্রিবেদী, সুরশ্রী, অভিজিৎ লাহিড়ী, নিখিলেশ পাল, স্বাতী, মানব চ্যাটার্জি, চৈতালী, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, অচ্যুতানন্দ দাস, অনিমেশ মুখার্জি, ভারতী গাঙ্গুলি, পার্থ রায়, অনুরাধা মজুমদার ও রবীন মজুমদার।

হাওড়া থেকে : সুব্রত দাশ, রাম।

নদীয়া থেকে : মনীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার, নিতাই মাল, পদ্মা সরকার।

চব্বিশ পরগণা (দক্ষিণ) থেকে বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত, পবন মুখোপাধ্যায়, কৌশিক দে।

চব্বিশ পরগণা উত্তর থেকে : বিশ্বজিৎ বিশ্বাস।

হুগলি থেকে : তন্ময় চক্রবর্তী, অমিত দাশগুপ্ত।

হাওড়া থেকে : পূরবী ঘোষ, কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

না, মহামূল্যবান 'সেমিনার' 'টেমিনার' নয়—তাই চেয়ার টেবিল সরিয়ে সতরঞ্চি পেতে বসে একেবারে চণ্ডীমণ্ডপের কায়দায় ঘরোয়া আলোচনাচক্র। তবে চা-সহযোগে সভা শুরু হতে সামান্য একটু দেরি হলো। মানে একটা বাজল আর কি! উপস্থিত ছিলেন ছাপান্ন জন। মাঝখানে কয়েকবার চা আর দুপুর নাগাদ আলুর দম সহ তিনটে রুটি আর দানাদারের মিষ্টি মুখ বোধ হয় আলোচনাটাকে খানিকটা প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। যাঁরা আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা বেশিরভাগই এসেছিলেন কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে। অর্থাৎ হাওড়া,হুগলি, নদীয়া উত্তর আর দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা থেকে। সভা শেষ হওয়ার কথা ছিল পাঁচটায়— যদিও ছটায়ও দেখা গেল জমাট আলোচনা চলছে। তবে হল্ ছাড়তে হলো তাই বাইরে আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক। এরপর অনেকেই চলে গেলেন। আর অতি উৎসাহীরা —হ্যাঁ ছিলেন, অনেকজনই ছিলেন। ঘড়ি না-দেখেও নিঃসন্দেহে বলা যায় আরও প্রায় ঘণ্টাতিনেক।

সেদিনের আলোচনার সংক্ষিপ্তসার নীচে দেওয়া হলো। প্রসঙ্গত, *বিওবি*-র একসময়ের কর্মী, সহমর্মী বর্তমানে প্রবাসী সুদীপ্ত সরস্বতীর পাঠানো একটিচিঠিও রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গত সংখ্যায়ও তার কিছু প্রসঙ্গ প্রকাশিত হয়েছে।

সেদিনের আলোচনার সংক্ষিপ্তসার

শিবপ্রসাদ নিয়োগী : গত কয়েকবছর *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী* পত্রিকার প্রকাশ কিছুটা অনিয়মিত। বছরে একটি সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হচ্ছে। কর্মীর অভাব, অর্থাভাব এবং সর্বোপরি নিয়মিত কাজকর্মের পরিকাঠামোর অভাব। যেমন বলা যায়— পত্রিকা প্রকাশর পর পত্রিকাটিকে নিয়মিত গ্রাহকদের কাছে পৌছাবার জন্যে গ্রাহক তালিকা বা ডাকবাক্সে ফেলার কোনো সুষ্ঠু প্রক্রিয়া নেই। কিংবা সাপ্তাহিক আড্ডা নিয়মিত চললেও যে ঘরে আপাতত বসা হচ্ছে সে-ঘর খোলার দায়িত্ব কে পালন করবে সেটাও একটা বড় সমস্যা হয়ে উঠেছে।

ওমপ্রকাশ চক্রবর্তী : পত্রিকার প্রধান সমস্যা 'লেখা' জোগাড় করা। সম্প্রতিকালে প্রয়োজনীয় ভালো লেখা পাওয়া যাচ্ছে না। এছাড়া বছরে একটি মাত্র ছাপা হলেও সুষ্ঠু পরিকাঠামোর অভাবে (যেমন গ্রাহক তালিকা নতুন করা ইত্যাদি) পাঠকদের কাছে নিয়মিতভাবে পত্রিকা পাঠানো যাচ্ছে না। ফলে ছাপা পত্রিকা জমে উঠছে।

রবীন চক্রবর্তী : *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী* পত্রিকা যখন শুরু হয় তখন এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলাম কিছু ভালো লোকজন দেখে। কিছু ভালো কাজ হচ্ছে এবং আমিও এই ভালো কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকব এরকমই একটা তাগিদ ভেতরে ভেতরে কাজ করেছিল। আজ আর ভিতর থেকে সেই তাগিদ বোধ করি না— সেটা বয়স বা সামাজিক যে-কারণেই হোক না কেন? তবে নিঃসন্দেহে একথা বলতে পারি, পত্রিকার প্রয়োজন ফুরোয়নি। আজ এই একুশ শতকেও *বিজ্ঞান* ও

বিজ্ঞানকর্মী-র মতো পত্রিকার খুবই প্রয়োজন আছে।

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় : বর্তমান সমাজে অগ্রগতির সঙ্গে *বিওবি* তাল মেলাতে পারছে না। ফলে নানা দিক থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে। আশির দশকের তুলনায় এখন যে-সব সুযোগ সহজে পাওয়া যায় তার অভাব দেখা দিচ্ছে। যেমন বলা যায় ই-মেল-এর ঠিকানা। এখনও *বিওবি*-র কোনও ই-মেল ঠিকানা নেই। এছাড়া পত্রিকা নিয়মিত করার মতো কোনও পরিকাঠামো নেই এবং এরকম একটা পরিকাঠামো তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। কর্মীর অভাবে যে-সব কাজ *বিওবি*-র হচ্ছে না, সেগুলো করার জন্যে কোনও আংশিক-সময়ের কর্মী নিয়োগ করা যেতে পারে কি-না ভাবা যেতে পারে। বাইরের বন্ধুরা যে প্রস্তাব দিয়েছেন পত্রিকা চালানো উচিত কিন্তু তাতো আপনা থেকে চলতে পারে না। তার জন্যে অবশ্যই দরকার নির্দিষ্ট একটা পরিকাঠামো, পত্রিকার একটা নিজস্ব ঘর বা ঠিকানাও।

শুভেন্দু দাশগুপ্ত : ছোট পত্র-পত্রিকার একটা প্রধান সমস্যা হলো টাকা-পয়সা। আলোচনা যতটুকু হয়েছে তাতে মনে হচ্ছে অর্থ সমস্যাটাই প্রধান নয়। তাই যদি হয় তাহলে আমরা অন্যান্য যে সমস্যাগুলো দেখা দিচ্ছে সেগুলো একটু আলাদা করে নিয়ে তার সমাধানের দিকে নজর ফেরাতে পারি। প্রশ্ন উঠেছে, আপাতত যে ঠিকানায় বসা হচ্ছে সেখানে সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে চাবি খোলা বা গ্রাহক তালিকা নবীকরণ করা নিয়ে। এই সভায় যাঁরা আগ্রহী ব্যক্তি আছেন, পত্রিকাটিকে চালানো উচিত মনে করেন বা কাজকর্ম করতে আগ্রহী তাঁরা কেউ কেউ একজন বা দুজন বা তিনজন একসঙ্গে দায়িত্ব নিয়ে আগামী তিনমাস বা ছ-মাসের মধ্যে গ্রাহক তালিকা নবীকরণ করার কাজটা সম্পন্ন করুন। এইরকম ছোট ছোট যে-সব কাজের কথা উঠেছে সেগুলোকেও নির্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে বা যেভাবে তার সমাধান হতে পারে তার দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে।

রবীন মজুমদার : আমাদের বন্ধু সুদীপ্ত সরস্বতী কিছু নির্দিষ্ট প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। সেই প্রস্তাবগুলি সংক্ষেপে আমি একটু বলে দিই। 'আশির দশকে গণবিজ্ঞান আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কর্ণধার *বিওবি*। নব্বই-এর শুরুতে গণবিজ্ঞান আন্দোলনে ভাটা পড়ায়, চালিকাশক্তি হিসেবে কোনো সামাজিক আন্দোলনের অভাবে *বিওবি* প্রকাশনা অনিয়মিত হয়ে আসে। এই পত্রিকার কি প্রয়োজন ফুরিয়ে এসেছে?... প্রকাশনা চালাবার পাশাপাশি আর কি কি নতুন কাজ করতে পারে?... লেখা পেলে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে *বিওবি*-র পরবর্তী সংখ্যাগুলো প্রকাশের দায়িত্ব নিতে আমি আগ্রহী। এছাড়া বিওবি-র ওয়েবসাইটকে বিজ্ঞান, টেকনোলজি ও পরিবেশ নিয়ে আন্দোলনের কাজে দরকারি তথ্যের ভাণ্ডার এবং আলোচনা ও বিতর্কের মঞ্চ হিসেবে গড়ে তোলা যায় কিনা... সেটাও একটা পরীক্ষা করে দেখা যায়। ডিজিটাল পথ *বিওবি*-র সামনে সম্ভাবনার যে নতুন দিগন্ত মেলে ধরছে, তার কতটা *বিওবি* পূরণ করতে পারে সেটাও দেখার। [বিস্তারিত মতামতের জন্য পৃ. 49-52 দ্রষ্টব্য]

পবন মুখোপাধ্যায় : বর্তমান সামাজিক অবস্থায় দেখা যাচ্ছে আপাতত এমন কোনো ব্যক্তি নেই যাঁকে ঘিরে একটা পত্রিকা চলতে পারে। যেহেতু ছোট পত্রিকার সব ধরণের সমস্যা প্রায় সবসময়েই থাকে। স্থানাভাব, কর্মীর অভাব, অর্থাভাব ইত্যাদি ইত্যাদি। এই মুহূর্তে সমাধান হিসেবে কিছু প্রস্তাব আমি দিতে পারি যেমন একটা দপ্তর বা ঠিকানার ব্যবস্থা আমি করতে পারি 98 , মহাত্মা গান্ধি রোড *মানব মন*-এর অফিসে। পত্রিকা সংক্রান্ত কাজ এখানে চালানো যেতে পারে। এছাড়া পত্রিকা ছাপাছাপি বা অন্যান্য দায়িত্বের ব্যাপারে আমি হাতের কাছেই দুজন যোগ্য ব্যক্তি দেখতে পাচ্ছি। তাঁদের একজন, ভাস্কর ব্যানার্জি ও দ্বিতীয়জন, তরুণ বসু। এছাড়া আর একটা ব্যাপার আমার মনে হয়, *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী* নামটি। নাম থেকে একেবারেই বিজ্ঞানকর্মীদের পত্রিকা বলে মনে হওয়ায় সাধারণ পাঠক বহুক্ষেত্রে আগ্রহ বোধ করেন না। তাই আমার প্রস্তাব নামটি পাল্টানো যায় কিনা একবার ভেবে দেখা যেতে পারে—অন্তত *বিওবি*-র কথা মাথায় রেখে। আমি যেহেতু দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কিছু বিজ্ঞান সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়েছি যাঁরা এই মুহূর্তে বিজ্ঞান আন্দোলনে কাজ করে চলেছেন। তাঁদের মধ্যে একটা কি interaction এর অভাব বোধ করেছি। আমার মনে হয় এরকম সংগঠিত প্রয়াসের সঙ্গে সহযোগিতার জন্যেও একটা পত্রিকা দরকার। এক্ষেত্রে *বিওবি* যদি নিয়মিত প্রকাশ করা যায়। তাহলে এই ধরণের প্রয়াসকে ভালোভাবে সহযোগিতা করা যায়। পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলী এটাও একটু গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে পারেন।

ভাস্কর ব্যানার্জি : একটা সময়ে যখন *উৎস মানুষ* পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম সে-সময়ে এক বন্ধুর সঙ্গে হাসপাতালে গিয়েছিলাম অন্য এক বন্ধুকে দেখতে। তার পাশের বেড়েই একজন রোগীর বিছানায় দেখি *উৎস মানুষ, বিজ্ঞান* ও

বিজ্ঞানকর্মী ইত্যাদি পত্রিকা। তাঁর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর প্রসঙ্গক্রমে পত্রিকার সংকটের আলোচনা সূত্রে মন্তব্য করেছিলাম, পত্রিকা বন্ধ করে দেবার কথা। সেই পাঠকের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে উত্তর পেয়েছিলাম : সন্তান জন্মের পর তাকে মেরে ফেলার অধিকার জন্মদাতার যেমন থাকে না তেমনি প্রয়োজনীয় উপকারী পত্রিকা প্রকাশের পর তা তুলে দেওয়ার অধিকারও পরিচালকদের থাকে না। কথাটা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, ঐ একইসূত্রে *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী* তুলে দেওয়ার অধিকারও পরিচালকদের হাতে নেই। আমাদের ভাবতে হবে, পত্রিকাটিতে কিভাবে সচল করা যায় তার কথা। এই আলোচনায় যোগ দেওয়ার ব্যাপারে পত্রিকা-বন্ধের যে আভাস আমি পেয়েছিলাম, এ-পর্যন্ত আলোচনা শুনে আমার মনে হচ্ছে, আমি একটু ভুল জায়গায় এসে পড়েছি। যাই হোক, আমার মনে হয়— পত্রিকা করব কেন? কিংবা করে কি হবে? —এরকম দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দ্বিধা বা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তাই সেটা অবশ্যই ঠিক হওয়া উচিত। পবন মুখোপাধ্যায় ইত্যাদিরা যে অর্থাভাবের প্রসঙ্গ তুলেছেন তার সঙ্গে এক মত নই কোনওভাবেই। পত্রিকা চালাবার সঠিক দিশা থাকলে এই মুহূর্তেই অর্থাভাব দূর করা সম্ভব। আর *বিওবি* চাইলে কাজ চালানোর জন্যে সল্টলেকে বসার একটা ব্যবস্থা এখনই করা যাবে। এছাড়া অন্যান্য কাজ একটু ভাগ করে নিলেই সম্ভব। ছাপাছাপির কাজটা অতি দক্ষতার সঙ্গে তরুণ বসু-র সঙ্গে আমি সামলাতে পারি। সে-ব্যাপারেও কোনও সমস্যা আমার হবে না।

মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার : বিজ্ঞান ও সমাজ বিষয়ে একটা দ্বিমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব নয় একথা মানতে পারি না।.... *বিওবি*-কে একটু পুনরবিন্যাস, সংগঠিত ও আধুনিকীকরণ করে নিতে হবে। এতে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। [দ্রষ্টব্য পৃ. 53-54]

রবীন মজুমদার : মণিদার সব বক্তব্যের সঙ্গে একমত নই। কিছু বিষয়বস্তু একত্রিত করতে পারলেই ব্যাপারটা একটা সুন্দর মসৃণ গতি পাবে এমনটা নয়।..... [দ্র.পৃ.55-61]

প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় : কাছাকাছি থাকার ফলে *বিওবি*-র সংকট অনেকদিন ধরেই শুনছিলাম আর সেই বিষয়টা একটু বুঝবার জন্যই এই সভায় আসা। একথা ঠিক যে ছোট পত্রিকা চিরকালই নানা-সমস্যার মধ্যে দিয়ে যায় বা গেছে। সব সমস্যা হয়তো অতিক্রম করা যায় না। তবো আলোচনা থেকে যেসব সমস্যার কথা উঠে এসেছে সে ব্যাপারে আমার সাধ্য মতো কিছু মতামত দেওয়ার চেষ্টা করছি।

পত্রিকা চালানোর সময় অনেক লোকজন থাকেন। তাদের নিজস্ব একটা commitment সেখানে সবসময়ই কাজ করে। আর সেটা মাথায় রেখেও আমার বক্তব্য হলো, পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। বরং তাকে চালানোর জন্য কিছু কিছু সহায়ক ভাবনা-চিন্তা করা যেতে পারে।

প্রথমত আজকের এই সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেও কিছু কিছু পত্র-পত্রিকা নিয়মিত-অনিয়মিতভাবে হলেও বেরোচ্ছে। তাদের সবারই কিছু না কিছু সংকট অবশ্যই আছে। তবে যেহেতু এই বিকল্প ভাবনার পত্রিকাগুলোর সংকট বহুক্ষেত্রেই একই রকমের এবং আমি নিজে একটা পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত তাই কিছু কিছু একথা জোর দিয়ে বলতে পারছি। আর সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই *বিওবি*-র সমস্যার সঙ্গে *কালধ্বনি*-র সমস্যারও যথেষ্ট সাজুয্য থাকবে। প্রসঙ্গত বলি যে, *বিওবি*-র এই transformation অর্থাৎ আরো broader aspect থেকে ভাবার বিষয়টা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে এবং ভালোও লেগেছে বিশেষত এই in search of alternative-এর ব্যাপারটা। পত্রিকা আলাদাভাবে কোনও ধরাবাঁধা সংগঠন হতে পারে না বা হয় না। কারণ পত্রিকায় সাধারণত দুধরণের লোক আসেন—এক, যাঁরা পত্রিকায় লেখা দেন আর যারা নানা কাজের সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে যুক্ত থাকেন। এছাড়াও নতুন মুখের আনাগোনা চলতে থাকে— তাঁরা অনেকে আসেন, চলেও যান, আর এই-আসা যাওয়াটা চলতেই থাকে। দ্বিতীয়ত, সাংগঠনিক সমস্যা নিয়ে বিশেষ কিছু বলা সম্ভব নয় কারণ পত্রিকা অনুযায়ী তার চরিত্রও খানিকটা পাল্টে যায় এবং একান্তই ভেতরে যাঁরা থাকেন তাঁরাই সেই সমস্যাটা ভালো বোঝেন এবং তার মোকাবিলা করতে পারেন। এছাড়াও *বিওবি*-র একটা distribution-এর সমস্যা আছে। সমস্যাটা খুবই সাধারণ বিশেষত ছোট পত্রিকার ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে আমাদের একটা চ্যানেল বার করার পরিকল্পনা চলছে। যেমন College Street-এর 'গ্রন্থালয়'-এ একটা table space থাকবে যাঁরা এ-ধরণের প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকা রাখবে। একটা বাড়তি কমিশন তাঁরা নেবে এবং কর্মীও ঐ গ্রন্থালয়েরই, ফলে পৌঁছে দেওয়া ছাড়া বাড়তি দায় বিশেষ কিছু নেই। এ-ব্যাপারে উদ্যোগ চলছে— মনে

হয় খুব শিগগিরই ফলপ্রসু হবে। এছাড়া খোকন চ্যাটার্জি কলেজ স্ট্রিটে (47 মহাত্মা গান্ধি রোডে) একটা এধরণের distribution centre খুলেছেন। সেখানেও পত্রিকা দেওয়া যায়—একটা sevice চার্জ লাগে এবং মোটামুটি বিভিন্ন জায়গায় তিনি নিজের দায়িত্বে পত্রিকা distribution করেন। তাঁকে ও কমিশনটা একটু বেশি দিতে হয়, বোধ হয় 40%-এর মতো।

আর একটা বিষয় আমরা ভাবতে পারি তাহলো অন্যান্য কিছু সমমানসিকতা মূলক পত্রিকাকে একটা serial-এ বার করা যায় কিনা। যেমন এমাসে যে-পত্রিকা বেরোল, পরের মাসে অন্য আর একটা। এবং প্রথম মাসের পত্রিকায় পরের মাসের পত্রিকার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে দেওয়া হলো যাতে পাঠক জানতে পারেন এবং এই পত্রিকার পাঠক অন্য পত্রিকার সম্পর্কে জানতে পারেন।

বাজেট প্রসঙ্গে রবীন-এর বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত নই। ছোট পত্রিকার বাজেট-ঘাটতি মেটানো সম্ভব নয়। এই ঘাটতি থাকবেই এবং এ-ব্যাপারেও দুএকজনের পরেই ভরসা করা ছাড়া গত্যান্তর থাকে না।

প্রচারের ব্যাপারে একটা ওয়েবসাইট খোলাই যায়। প্রয়োজনে সেটা jointly-ও খোলা যায় যাতে খরচ কম হয় এবং একই সঙ্গে দুই বা ততোধিক পত্রিকার বিষয়বস্তু উল্লেখ করা যায়। আর একটা ব্যাপার আমরা মাথায় রাখতে পারি, outside Bengal আমাদের যে-যোগাযোগ আছে তাকে কাজে লাগিয়ে যদি একশো কপির মতো পত্রিকা বাইরে পাঠাতে পারি। সেটা ভারতের মধ্যে পঞ্চাশ কপি এবং ভারতের বাইরে পঞ্চাশ কপির মতো। এটা করা গেলে তার থেকে একটা বড় amount পাওয়া যেতে পারে যা একটা বড় আর্থিক support হতে পারে। তবে publication jointly না ভেবে সেটা নিজের নিজের মতো করেই চলুক। এতে সমস্যা কমই হবে মনে হয়।

মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার : *ফ্রন্টিয়ার* পত্রিকারও এরকমই একটা ওয়েবসাইট খোলা হয়েছিল এবং সেটা খুব কার্যকর হয়নি। ফলে এক্ষেত্রেও কার্যকর হবে এমনটা নাও হতে পারে।

কুমারেশ মিত্র : তবে joint website কার্যকর হবে না এমনটাও বলা যায় না এই উদাহরণে—সুতরাং এক্ষেত্রে মণিদার বক্তব্যই যে সঠিক হবে তেমনটা নাও হতে পারে।

সুরশ্রী : আমার মনে হয় website-এর newsgroup-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায় তাতে অনেক বেশি কাজ হবে বলে মনে হয়। এটা যদিও একটা practice-এর ব্যাপার তাহলেও এর ফলে বাইরের পুরনো *বিওবি*-র লোকজনের সঙ্গে একটা ভালো যোগাযোগ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে।

বিপ্লব শিকদার : নিউজগ্রুপ অত্যন্ত বিরক্তিকর। বরং এক্ষত্রে প্রশান্তদার বক্তব্য অনেক বেশি যুক্তিসংগত মনে হয় অর্থাৎ পত্রিকা বাইরে পাঠানো সেটা পঞ্চশ বা একশো কপি যাই হোক।

উত্তান বন্দ্যোপাধ্যায় : যেহেতু *বিওবি* সবাইকে accomodate অর্থাৎ সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে তাই সাহস নিয়ে কিছু কথা বলছি। আমাদের নিজেদের individualistic trend-টা থেকে বেরোতে চাইছি আর সেক্ষেত্রে *বিওবি* অনেক বেশি কার্যকর হতে পারে। রবীনদার [মজুমদার] বক্তব্য সঠিক বুঝতে পারছি না তাই এ-সম্পর্কে কোনও মতামত না-দিয়েও বলতে পারি little magazine-এর এখনও অনেক কাজ বাকি। বহুকাজ untraced থেকে গেছে যা কোনো বড় media বা electronic media করে না। আর সে সব কাজের সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে *বিওবি*-র মতো পত্রিকাই একমাত্র ভরসা। তবে এটাও বলা যায় যে, *বিওবি*-র যে individualistic ধারা— সেটা অবশ্যই ত্যাগ করা উচিত। একটু broader prespective-এ না-ভাবতে পারলে কাজগুলো গুছিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে *বিওবি*-র সঙ্গে যারা আছে এবং যারা committed তাঁরা আর একটু গুছিয়ে ভাবলে যথেষ্ট উপকার হবে বলে মনে হয়।

শুভেন্দু দাশগুপ্ত : আলোচনা অনেকদূর গড়িয়েছে। এবার কিছু concrete ধারণা তৈরি করতে না-পারলে ব্যাপারটা একই জায়গায় থেকে যাবে। এ-ব্যাপারে ভাস্কর এবং পবনের আলোচনার সঙ্গে আমি একমত। Day to-day-work-এর একটা গতিবিধি ঠিক করে নিতে পারলে কাজ অনেকটাই এগোবে। তবে এবার আমরা নির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি।

তরুণ বসু : রবীন মজুমদার যে প্রস্তাব রেখেছেন এটা আমরা একটু ভেবে দেখতে পারি। *বিওবি* বাঁচানোর পক্ষে ঐ প্রস্তাবটা অনেক বেশি কার্যকর হতে পারে।

স্বপন দাস : তবে টাকার জোগাড় হয়ে গেলেই রবীনদার প্রস্তাবিত project-টা গড়গড়িয়ে চলবে তার কোনও মানে নেই। অন্যান্য ব্যাপার নিয়েও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বলাই : বিশু অর্থাৎ বিশ্বজিৎ বিশ্বাস একটা প্রস্তাব দিচ্ছে,

প্রতি মাসের তৃতীয় শনিবার ও কলকাতায় আসে আর তাই পরের রবিবারটা তিন/চার ঘণ্টা সময় কোনও কাজ থাকলে ও করে দিতে পারে। প্রস্তাবটা আমরা ভেবে দেখবে পারি।

বিপ্লব শিকদার : Website এর কাজটা আমি করে দিতে পারব।

শিবপ্রসাদ নিয়োগী : আর একজন কেউ থাকলে প্রেস এর কাজটা আমি করতে পারব।

কল্যাণ মৈত্র : তিন/চার জন মিলে সপ্তাহে তিন/চার দিন সময় দিতে পারব। নির্দিষ্ট কিছু কাজ থাকলে সেটা ঐ সময়ে করে দেওয়া সম্ভব। এছাড়া *বিওবি*-র জন্যে নিয়মিত বিজ্ঞাপন জোগাড় করা এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত বা অন্যান্য টাকা পয়সা জোগাড় করার দায়িত্ব নিতে পারব।

উত্তান বন্দ্যোপাধ্যায় : বিজ্ঞাপন নেওয়ার ব্যাপারে *বিওবি*-র কোনো ছুঁৎমার্গ না-থাকলে আমি অনেক বিজ্ঞাপন জোগাড় করে দিতে পারব।

ওমপ্রকাশ চক্রবর্তী : Electronic media-র ব্যবহার নিয়ে আমাদের বেশি ভাবনা চিন্তা করে বিশেষ কোনও লাভ হবে বলে মনে হয় না বরং আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যের জায়গা থেকে বিষয়টা ভাবনাচিন্তা করলে ভালো হবে মনে হয়।

রবীন মজুমদার : এ সমস্যা (!) আমরা আগে থেকেই দেখেছি এবং দেখছি। বরং পত্রিকার মূল সমস্যা নিয়ে একটু আলোচনায় আসা যাক এবার। প্রথমেই অর্থ সমস্যা সম্পর্কে এবং anthology করার ইত্যাদি concrete সমস্যাগুলো একে একে সমাধান করার কথা ভাবতে পারি। যদি আমরা পত্রিকার বিস্তৃতি ঘটাতে না পারি তাহলে খুব বেশি এগোরে পারব না।

নিলয় রায় : আজকে সময় যা তাতে আলোচনা শেষ হবে না। ফলে অন্য একটা দিন বিশেষত friends meet-এর মতো কোনও সভায় আলোচনা করা যায় কিনা আমরা একটু ভেবে দেখতে পারি।

অচ্যুতানন্দ দাস : Agenda-য় যে সব বিষয় আলোচনা হলো তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে একথা সত্যি যে, *বিওবি*-র প্রাণ হলো তার লেখা। অনেকদিন থেকেই পত্রিকা পড়ি বর্তমানে একখানায় নামলেও সেটি খুঁটিয়েই পড়ি। রচনাগুলি সম্পর্কে কিছু suggestion হলো *বিওবি* র লেখার বিষয় কেন আরও বিস্তৃত হয় না। আরও গুছিয়ে পরিবেশন করা যায় না কেন? *কালধ্বনি* পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা পড়ে খুবই ভালো লেগেছে এবং তার presentation অনেক সুন্দরভাবে করা হয়েছে—*বিওবি*-র ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয় না কেন? সাধারণ মানুষের একটা দাবি তো আছেই যে পত্রিকা নির্দিষ্ট সময়ে ঠিকঠিকভাবে বার করা এবং লেখাও যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পরিবেশন করা।

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় : যারা বিষয়বস্তু ঠিক করবে সেরকম একটা team *বিওবি*-র থাকলে ভালো হতো। আমার নিজের দিক থেকে বলতে পারি anthology-র কাজটা যদি হয় তাহলে আমি সেই team-এর সঙ্গে থাকতে রাজি আছি।

রঞ্জন ভদ্র : পত্রিকা পড়ে কোনও দিন বুঝতে পারি না পত্রিকা কার জন্যে, পাঠক না শুধু লেখকের জন্যঞ্জ এই বিষয়টা একটু ভাবলে ভালো হয়।

আলোচনা শেষে কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব এসেছিল কিছু কাজ সম্পর্কে

- ❑ গ্রাহক তালিকা নতুনভাবে সাম্প্রতিক করবে প্রদীপ দত্ত। তাঁকে সহযোগিতা করবে তন্ময় ভট্টাচার্য ও বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত।
- ❑ আশুতোষ শীল লেন এর *কালধ্বনির* ঘরেই আপাতত আড্ডা চলবে। পবনের সঙ্গে কথা বলার ভিত্তিতে *'মানবমনে'*র অফিস ব্যবহারের কথা ভাবা হবে যোগাযোগ কেন্দ্র হিসেবে। প্রয়োজনীয় ঘরের খোঁজ ইতিমধ্যে চলতে থাকবে।
- ❑ সম্পাদক মণ্ডলীর এর ব্যাপারে একটা আলোচনা হয়েছিল এবং নামও কিছু প্রস্তাব করা হয়েছিল। তার মধ্যে ছিলেন : রবীন মজুমদার, রবীন চক্রবর্তী, সুভাষ গাঙ্গুলি, স্বপন দাস, শুভেন্দু দাশগুপ্ত, অভিজিৎ লাহিড়ী ও মনীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার। তবে শেষ পর্যন্ত কেউই আলাদা করে সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য হিসেবে থাকতে রাজি হন নি।
- ❑ *বিওবি*-র সামগ্রিক কাজকর্ম করার ব্যাপারে যারা উৎসাহী ছিলেন এবং সমর্থিত হয়েছিল যাঁদের নাম তাঁরা হলেন : রবীন মজুমদার, তরুণ বসু, স্বপন দাস, বিপ্লব শিকদার, বলাই চক্রবর্তী, শিবপ্রসাদ নিয়োগী, বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত, ভাস্কর ব্যানার্জি, পবন মুখোপাধ্যায়, ওমপ্রকাশ চক্রবর্তী, প্রদীপ দত্ত, দোলা সেন।
- ❑ এছাড়া ও সভায় দুহাজার টাকা বছরে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন যথাক্রমে বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত, রবীন চক্রবর্তী, রবীন মজুমদার।

সংকলক : ত. ব.

টু বি অর নট টু বি ও বি

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী-র 3 জুলাই 2004 এর আলোচনাসভায় উপস্থাপনের জন্য। —সু. স.

1977 সালে *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী* বা *বিওবি*-র জন্ম হয়েছিল বিজ্ঞানকর্মীদের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গণতন্ত্রীকরণ আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে। আশির দশকে এই আন্দোলন থিতিয়ে গেলেও *বিওবি*-র প্রকাশনা কিন্তু বজায় রইল। *বিওবি* হয়ে উঠল সদ্য উঠে আসতে থাকা গণবিজ্ঞান আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কণ্ঠস্বর। পরিতাপের বিষয়, নব্বইয়ের দশকের শুরুতেই পশ্চিমবঙ্গের গণবিজ্ঞান আন্দোলন থিতিয়ে পড়ে। এর ফলে, চালিকাশক্তি হিসেবে কোনো সামাজিক আন্দোলনের অভাবে, *বিওবি*-র প্রকাশনা অনিয়মিত হয়ে আসে। শুরুতে *বিওবি*-র প্রকাশনার কালক্রম ছিল দ্বিমাসিক—প্রথমে তা হয়ে দাঁড়াল ত্রৈমাসিক, তারপর ষাণ্মাসিক এবং এখন তা গিয়ে ঠেকেছে বাৎসরিকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে *বিওবি*-র পঁচিশ বর্ষপূর্তি সংখ্যায় (জানুয়ারি-ডিসেম্বর 2003) "বিওবি-র ভবিষ্যৎ" লেখায় প্রশ্ন তুলেছিলাম, "পত্রিকাটিকে চালিয়ে নিয়ে যাবার মতো কোনো সামাজিক আন্দোলনের অভাবজনিত পরিস্থিতিতে *বিওবি*-র কি কিছু করার নেই?... এই পত্রিকার প্রয়োজন কি ফুরিয়ে এসেছে নাকি এখনও এটি প্রকাশিত হওয়া দরকারি? প্রকাশনা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি *বিওবি* আর কি কি নতুন কাজ করতে পারে? লেখক, পাঠক এবং বিজ্ঞানের গবেষক হিসেবে *বিওবি*-র ভবিষ্যতের জন্যে আমাদের কি কি দায়িত্ব রয়েছে?"

একই সংখ্যায় *বিওবি*-র এখনকার সম্পাদকেরাও একই ধরণের প্রশ্ন— যেমন, "... বারবার প্রশ্ন এসেছে কী দরকার *বিওবি* চালিয়ে যাবার — ক'জন পড়ে? পাঠকরা কি চান *বিওবি* বেঁচে থাকুক?"— তুলে মন্তব্য করেছেন, " এসব প্রশ্নের কোনও উত্তর জানা নেই।" সম্পাদকদের এই না-জানার স্বীকারোক্তি *বিওবি*-র বাঁচা-মরা সংক্রান্ত মতামতের বর্ণালীর এক প্রান্তে। বর্ণালীর অন্য প্রান্তে রয়েছে আমার প্রকাশিত কনভিকশন (conviction): " বিজ্ঞান গবেষণার জগতটাকে এবং রাজনীতি, কর্পোরেশন, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে এই জগতের জটিল সম্পর্ক দিন দিন যত কাছ থেকে দেখছি, ততই উপলব্ধি করছি, কোনো আন্দোলনের ওপর ভর না করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েই *বিওবি* অর্থবহ ভূমিকা পালন করতে পারে।" এর পর *বিওবি* কি ধরণের কাজ করতে পারে, তার সুনির্দিষ্ট (concrete) প্রস্তাব পেশ করে বাস্তব উদাহরণ থেকে সেরকম কিছু আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ব'লে মনে হওয়া কাজ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। সেই আলোচনার ভিত্তিতে মন্তব্য করেছিলাম: ..."*বিওবি*-র প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়নি।... আমরা... ব্যক্তি হিসেবে নিজেদের বিশেষজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা নিয়ে যদি *বিওবি*-র গবেষণা ও প্রকাশনা চালিয়ে যাওয়ার কাজে এগিয়ে আসি, তাহলে এই পত্রিকা তার সম্ভাবনা পূরণ করতে পারবে।"

অন্যদিকে, আমরা যারা এখন *বিওবি*-র জন্যে কিছুই করছি না, আমাদের এই গড়িমসি বা ঢিলেমি (inaction) যদি আরো কিছুদিন চালিয়ে যাই, তাহলে মাত্র দুটো সম্ভাব্য ফলাফলের কথাই ভাবতে পারছি। হয় *বিওবি* আর একটা পাড়ার ক্লাবের আড্ডাখানা হয়ে উঠবে, নয়তো এর প্রকাশনা একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে। এখনকার সামাজিক চাহিদা এবং তাতে অর্থপূর্ণভাবে সাড়া দেওয়ার যে সম্ভাবনা *বিওবি*-র রয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই দুই ফলাফলই হবে লজ্জাকর।"

এইসব মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পর ছমাস কেটে গিয়েছে। এই সময়ে আমার কনভিকশন আরো দৃঢ় হয়েছে যে, *বিওবি* বন্ধ করার কোনো দরকার নেই এবং *বিওবি*-কে অর্থপূর্ণভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আমাদের এখনও হারিয়ে যায়নি। বছরে অন্তত একবার *বিওবি* বের করার বৌদ্ধিক রসদ আমাদের

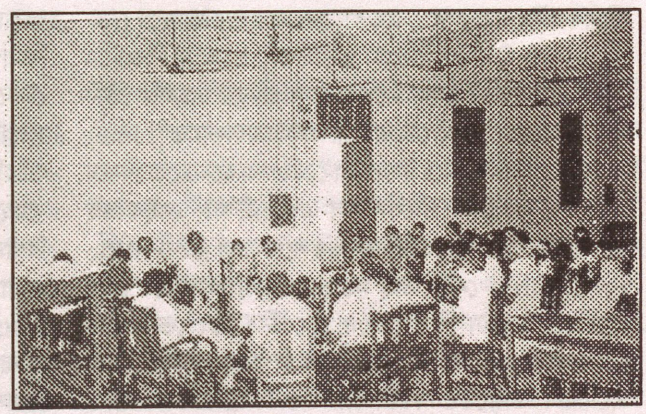

অবশ্যই রয়েছে। কিভাবে আমরা *বিওবি*-কে তার সম্ভাবনা পূরণের লক্ষ্যের দিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং এই মুহূর্তে *বিওবি* কী ভূমিকা পালন করতে পারে, সে-সব নিয়ে এবার আলোচনা করব।

"বিওবি-র ভবিষ্যৎ" লেখায় ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা নিয়ে *বিওবি* কি করতে পারে সে-সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম এবং এ-সম্পর্কে যেসব গুরুতর প্রশ্ন দেখা দেয় সে-সব নিয়ে অনিল সদগোপালকে *বিওবি*-তে আমন্ত্রণ করে আলেচনার প্রয়োজনীয়তার কথাও লিখেছিলাম।

অনিল সদগোপালের বন্ধুরা তাঁকে *বিওবি*-তে আলোচনার আমন্ত্রণ জানাবেন কি না জানি না। তবে আমি এখন অনিলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালাচ্ছি। কেন? সম্প্রতি (3 মে 2004) ম্যাসাচুসেটস ইনসটিটিউট অফ টেকনোলজিতে ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা নিয়ে আলোচনা হলো। বক্তা ছিলেন দুজন গ্যাসপীড়িত মহিলা— রশিদা বাঈ এবং চম্পা দেবী। ওঁরা গ্যাসপীড়িত মানুষজনের আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় কর্মী। এম আই টি-র দেয়ালে সাঁটা প্রচারপত্রে ঘোষণা করা হয়েছিল, ওঁরা "পরিবেশে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী।" যাই হোক, আলোচনাসভায় ভোপালের গ্যাসপীড়িত মানুষজনের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে ওঁদের প্রশ্ন করে ভারতের সরকারি বিজ্ঞানীদের ভূমিকা সম্পর্কে মারাত্মক অভিযোগের কথা শুনলাম। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে অনিলদের তৈরি করা গবেষণাভিত্তিক রিপোর্ট সম্পর্কে জানতে চেয়ে দেখলাম, দোভাষীর কাজ করা ভোপাল আন্দোলনের ভারতীয় কর্মী এবং আমেরিকায় ভোপাল আন্দোলনের উপস্থিত কর্মী — এঁদের কেউই এ-বিষয়ে একেবারেই অবহিত নন।

এর কিছুদিন পরে একজন নোবেল পুরস্কার পাওয়া জীববিজ্ঞানীর বক্তৃতার শেষে চা-জল খাবারের আসরে (reception) উপস্থিত একজন প্রভাবশালী ভারতীয় বিজ্ঞানীর কাছে অনিলদের রিপোর্ট নিয়ে মতামত জানতে চাইলাম। উনি বললেন, "হ্যাঁ, অনিল তো এনিয়ে একটা মহাভারত (tome) রচনা করেছিল। যা নিয়ে রিপোর্টটা তৈরি করা হয়েছে, সেবিষয়ে অনিলের কোনো প্রোফেশনাল এক্সপার্টিজই নেই। ওই রিপোর্টটার কোনো বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসযোগ্যতা (scientific credibility) নেই। তাই মহাভারতখানা আদালতে পেশ করা হলেও ওটা কিন্তু ধোপে টেকেনি। বরং ভোপালের গ্যাসদুর্ঘটনার ওপর বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য রিপোর্টটা এসেছিল ভারতের কাউন্সিল অফ সাইন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের (CSIR) সে সময়কার ডিরেক্টর এস. বরধ্‌রাজনের (S. Vardhrajan) কাছ থেকে।"

ভোপালের গ্যাসপীড়িত মানুষের সংগ্রামে সাহায্য করার লক্ষ্য নিয়ে সরকারি বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত ও কর্মকাণ্ডকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যে রিপোর্ট অনিলরা তৈরি করেছিলেন, সে-সম্পর্কে ভোপাল আন্দোলনের কর্মীদের এবং একজন প্রভাবশালী ভারতীয় বিজ্ঞানীর বক্তব্য শোনার পর আমি এখন মনে করি, এনিয়ে অন্য কোনো বিশেষজ্ঞের বাণী শুনে আর কাজ নেই। বরং অনিলদের রিপোর্টটা আমাদের নিজেদের পড়ে দেখে আমাদেরই এ-বিষয়ে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কিন্তু পড়ে দেখার জন্যে ওই দুষ্প্রাপ্য রিপোর্টটা পাবো কোথায়? আমরা একটু উদ্যোগ নিলেই কিন্তু রিপোর্টের লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পুরো রিপোর্টটাকে ডিজিটাইজ করে সকলের পড়ার জন্যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে প্রকাশ করতে পারি।

ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে একটি পিপলস মিডিয়া হিসেবে *বিওবি* হাজির হোক— এটা অনেকদিন ধরেই চাইছিলাম। কিন্তু এনিয়ে এতদিন কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়ে ওঠেনি। দেরিতে হলেও এবার *বিওবি*-র ওয়েবসাইট তৈরি করার কাজটা শুরু করতে চাই। এ-কাজ করার জন্যে দরকারি প্রশিক্ষণ হিসেবে এম আই টি-তে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের একটা কোর্স নিয়েছি। তাছাড়া হার্ভার্ড ল স্কুলে কপিরাইট সংক্রান্ত কোর্স নিয়েছি। কিন্তু কাজে হাত দিতে গিয়ে দেখলাম, বিনেপয়সায় ওয়েবসাইট তৈরির জায়গা সহজেই পাওয়া গেলেও সমস্যা হলো, সেই ওয়েব স্পেস নানা কর্পোরেশনের বিজ্ঞাপনে ভরা। ওয়েব স্পেস কেনার সামর্থ্য না থাকায় *বিওবি*-র ওয়েবসাইটে কি ভোপালের গ্যাসপীড়িত মানুষের সংগ্রাম নিয়ে আলোচনার পাশেই বর্ষিত হবে ডাও কেমিক্যালের মতো মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশনের বিজ্ঞাপন? এই প্রশ্নটা এম আই টি-তে "হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড টেকনোলজি" নামে এক কনফারেন্সের একটি ওয়ার্কশপে সম্প্রতি তুলে ধরেছিলাম। অংশগ্রহণকারী দুটো গ্রুপের প্রতিনিধিরা বিজ্ঞাপনমুক্ত ফ্রি ওয়েব স্পেস স্বাধীনভাবে ব্যবহারের জন্যে দিতে পারবেন বলে জানিয়েছেন। না আঁচালে বিশ্বাস নেই ঠিকই, তবে দুটো গ্রুপের প্রতিনিধিরা প্রতিশ্রুতি না রাখতে পারলেও কোনো না কোনো অ্যাক্টিভিস্ট গ্রুপের (activist group) কাছ থেকে ইন্টারনেটে *বিওবি* বের করার জন্যে বিনেপয়সায় ওয়েব স্পেস পাওয়া যাবে বলেই আমার বিশ্বাস।

বিওবি-র ওয়েবসাইট তৈরি করতে গিয়ে প্রশ্ন ওঠে, ইংরেজিতে কোন্ বানানে "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী" লেখা সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে এম আই টি-তে একটা সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছি, Biggan O Biggankormi, Vigyan O Vigyankarmi, Vijnan O Vijnankarmi এবং Viggan O Viggankormi— এই চারটে বানানের মধ্যে প্রথমটাই বাংলা উচ্চারণের সবচেয়ে কাছাকাছি। তাই আমি ইংরেজিতে Biggan O Biggankormi লিখতে চাই। তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বানানও কোনো না কোনোভাবে ওয়েবসাইটে ঢুকিয়ে দেব যাতে ঐ দুটো বানান দিয়ে ওয়েব সার্চ করলেও *বিওবি*-র ওয়েবসাইটের সন্ধান মেলে। এনিয়ে আপনাদের কারও কোনো জোরালো আপত্তি থাকলে তা কারণসহ জানাতে অনুরোধ করছি।

বিওবি-র ওয়েবসাইট তৈরি হয়ে গেলে ছেপে বের করার পাশাপাশি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবেও *বিওবি*-র পরবর্তী সংখ্যা আমরা প্রকাশ করতে পারব। তাছাড়া *বিওবি*-র পুরনো সংখ্যায় প্রকাশিত যেসব লেখা এখনও প্রাসঙ্গিক, সেগুলোকে বিষয়ের ভিত্তিতে সাজিয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য সহযোগে ওয়েবে প্রকাশ করে *বিওবি*-র আর্কাইভ (archive) তৈরি করতে পারব। এসবের পাশাপাশি বিজ্ঞান, টেকনোলজি, পরিবেশ ও সমাজ সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্দোলনের কাজে দরকারি তথ্যের রিসোর্স হিসেবেও *বিওবি*-র ওয়েবসাইট অর্থপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ভোপালের আন্দোলনের ক্ষেত্রে অনিলদের পুরো রিপোর্টটা ইন্টারনেটে প্রকাশ করা এরকম একটা কাজের নমুনা। এবার এ-ধরণের আরেকটি কাজের কথা আলোচনা করব।

এবছরের জানুয়ারিতে প্রকাশিত *River Linking: A Millennium Folly* বইয়ের একটি প্রবন্ধে মেধা পাটকার লিখেছেন :

> Once... [the push to the ... paradigm and the politics of water management that is now an election agenda, through interlinking of rivers] crosses the limits, relieves the planners of their present day defenses, their worries about our questioning and the likely opposition by the organized masses, fooling the scarcity-stricken of flood driven populations through the media propaganda and carry away some ignorant intellectuals to careerist professionals along, the time will be gone!... We must link ourselves, form alliances... ... We must tell our South Asian counterparts about the huge impact each of the country—Nepal, Bangladesh or even Bhutan— will face if Brahmaputra or Ganga is diverted, not just linked. ... We must stand up for the riparian rights of our neighbouring countries. We must begin a dialogue— well informed with common people to self-righteous professionals, and also a face-to-face with the politicians, the decision-makers in Interlinking of Rivers ... ... Such linkages must go beyond national borders into an international alliance if we have to challenge every investor who will be devoted to profit, but not to people of India.
> ..."An urgent and widest possible campaign to make people belonging to various sections aware of the 'Plan' and mobilizing them into action— raising questions to challenges—appears to be the need of the hour."

এই পরিপ্রেক্ষিতে *বিওবি* তার সীমিত সামর্থ্য নিয়ে কিছু দরকারি কাজ করতে পারে। প্রস্তাবিত রিভার লিংকিং-য়ের বিভিন্ন সমালোচনা (critique) ইন্টারনেটের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রতিটি সমালোচনাকে আমরা কিন্তু *বিওবি*-র ওয়েবসাইটে একজায়গায় তুলে ধরতে পারি হাইপারলিংক(hyperlinks) তৈরি করে। এটা করতে পারলে *বিওবি*-র ওয়েবসাইট রিভার লিংকিং-এর ওপর বাংলায় এবং ইংরেজিতে প্রকাশিত প্রতিটি open access critique-এর একটি ডিজিটাল লাইব্রেরি বা ভার্চুয়াল লাইব্রেরি

(virtual library) হিসেবে কাজ করবে। এই লাইব্রেরি রিভার লিংকিং সংক্রান্ত বিতর্কে এবং আন্দোলনে তথ্যের ভাণ্ডার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। উৎসাহী ব্যক্তিরা উদ্যোগী হলে *বিওবি*-র তরফ থেকেও একটি সমালোচনা তৈরি করে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান (signature campaign) চালিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে তা পাঠানো যায়। একই সঙ্গে ঐ চিঠির একটা কপি *বিওবি*-র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা যায় আরো স্বাক্ষরের আবেদন জানিয়ে।

বিওবি চালু থাকবে না উঠে যাবে তা নিয়ে আজকের এই আলোচনায় আমাদের স্মরণ করা দরকার, যে *সাইন্স ফর দ্ পিপল* (*Science for the People*) পত্রিকা একসময় বিজ্ঞানীদের সামাজিক দায়িত্ববোধের বিষয় (issue) নিয়ে আমেরিকায় আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল, তা 1990 সাল থেকে আর প্রকাশিত হচ্ছে না। পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো আমেরিকার কেমব্রিজ শহর থেকে। এই শহরে এসে ঐ পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর বেশ কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। তাঁদের কেউ হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে, কেউ এমআইটি-তে, কেউ বস্টন (Boston) ইউনিভার্সিটিতে বা অন্যত্র গবেষণা ও অধ্যাপনার পেশায় নিয়োজিত। এঁদের প্রত্যেকেই নিজের নিজের মতো করে কোনো না কোনোভাবে সামাজিক কর্মপ্রক্রিয়ার (social activism) সঙ্গেও জড়িত। এসব সত্ত্বেও *সাইন্স ফর দ্ পিপল* পত্রিকাটিকে আবার চালু (revive) করার ব্যাপারে কোনো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে এঁদের কেউই কিন্তু এখনও এগিয়ে আসেননি। কেন আসেননি তা নিয়ে প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা যুক্তি নিজেদের পকেট থেকে বের করেছেন। এরকমই যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে পত্রিকাটির সম্পাদকমণ্ডলীর একজন দীর্ঘদিনের সদস্য, যিনি এখন একটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস প্রোফেসর, আমাকে গতবছর যা বলেছিলেন তা হলো, "এখন ওসব করে আর কি হবে? হোল ওয়ার্ল্ড ইজ ফাক্‌ড্ আপ (whole world is fucked up)।" উনি একজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি—বৃদ্ধ বয়েসেও একেবারেই বসে যাননি। ব্যক্তি হিসেবে এখনও সোশ্যাল অ্যাকটিভিজম চালিয়ে যাচ্ছেন। তা সত্ত্বেও ওঁর এই যুক্তি! পত্রিকা প্রকাশের প্রক্রিয়ায় একবার ছেদ পড়ার এটি একটি করুণ পরিণতি।

যাঁরা ভাবছেন "*বিওবি* যেভাবে চলছে, এভাবে আর একে চলতে দেওয়া যায় না— আপাতত *বিওবি*-র প্রকাশনা বন্ধ রেখে বেশ কিছু সমস্যা সমাধান করে পরে কখনো বেশ আটঘাট বেঁধে নতুন করে আবার *বিওবি* বের করব," তাঁদের *সাইন্স ফর দ্ পিপল*-এর অভিজ্ঞতার নিরিখে আরেকবার ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি। *বিওবি* সংকটের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এখনকার সামাজিক চাহিদায় অর্থপূর্ণভাবে সাড়া দেওয়ার যে সম্ভাবনা *বিওবি*-র রয়েছে, তাকে কি অস্বীকার করতে পারেন? নানাদিক দেখেশুনে আমার মনে হয়, একবার *বিওবি*-কে মেরে ফেললে আর কোনোদিনই *বিওবি*-তে প্রাণসঞ্চার করা সম্ভব হবে না। তাই আমি *বিওবি* চালিয়ে যাওয়ার সপক্ষে। ধুঁকতে থাকা *বিওবি*-কে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেই এর মান উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। যে আড্ডাকে বাদ দিয়ে *বিওবি* বের করার কথা কল্পনাই করা যায় না, প্রতি সপ্তাহে সেই "*বিওবি*-র আড্ডা" চালানোর জন্যে যথেষ্ট সংখ্যক উৎসাহী ব্যক্তি এখন আর না পাওয়া গেলেও আমি বলব, তবুও আড্ডা চলুক— প্রতি সপ্তাহের বদলে এখন থেকে না হয় প্রতি মাসে একবার করে আড্ডার আসর বসুক। ছেপে *বিওবি* বের করার আর্থিক সঙ্গতি যদি আমাদের আর না থাকে, তাহলেও কোনো খরচাপাতির মধ্যে না গিয়ে আমরা কিন্তু ওয়েব *বিওবি* বের করে যেতে পারি। এখন *বিওবি*-র প্রধান সমস্যা যথেষ্ট সংখ্যক ভালো লেখা না পাওয়া। আপনারা, *বিওবি*-র যে-সব বন্ধুরা, আমার বক্তব্য শুনছেন, আমার বিশ্বাস আপনাদের সকলেরই কোনো না কোনো বিষয়ে ভালো লেখার ক্ষমতা আছে। আপনাদের মধ্যে যাঁরা বিজ্ঞান, টেকনোলজি ও সমাজ সম্পর্কে ভালো লেখার ক্ষমতা ধরে বসে আছেন, তাঁদের কাছে আমার আবেদন, মাঝে মধ্যে দু-একটা ভালো লেখা তৈরি করার মাধ্যমে নিজেদের কণ্ঠস্বরকে আমাদের একটু শুনতে দিন এবং *বিওবি*-কেও বেঁচে থাকার রসদ যোগান। লেখা পেলে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব *বিওবি*-র পরবর্তী সংখ্যাগুলো প্রকাশের দায়িত্ব নিতে আমি আগ্রহী। তাছাড়া *বিওবি*-র ওয়েবসাইটকে বিজ্ঞান, টেকনোলজি ও পরিবেশ নিয়ে আন্দোলনের কাজে দরকারি তথ্যের ভাণ্ডার এবং আলোচনা ও বিতর্কের মঞ্চ বা ফোরাম হিসেবে গড়ে তোলা যায় কি না, সেটাও একটা এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে করে দেখতে চাই। ডিজিটাল পথ *বিওবি*-র সামনে সম্ভাবনার যে নতুন দিগন্ত মেলে ধরছে, তার কতটা *বিওবি* পূরণ করতে পারে, সেটাই এখন দেখবার। সম্ভাবনা পূরণের লক্ষ্য নিয়ে ডিজিটাল পথে *বিওবি*-র চলা এবার শুরু হোক।

সুদীপ্ত সরস্বতী
এম আই টি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

বিওবি-র অর্জন ও সম্ভাবনার দিশা নির্দেশে কিছু কথা

এক : বিজ্ঞান ও সমাজ বিষয়ে দুমাস অন্তর দ্বি-ভাষিক ছোট একটি পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ, তাও আবার বেশিরভাগই প্রকাশিত বই, জার্নাল বা ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত তত্ত্ব, তথ্যাদি নিয়ে একেবারে তুচ্ছ না হলেও, বেশি কিছু যে নয়, তা হয়তো অনেকেই মানবেন। এ অনেকটা আমাদের বই জার্নাল থেকে তথ্য সংগ্রহ করে নোট তৈরি করে ক্লাসে পড়ানোর মতো মামুলি ব্যাপার। এইরকম পত্রিকা প্রকাশের সারবত্তা আজকাল বেশ কমে গেছে, বিশেষ করে শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণী এবং ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব একান্ত প্রয়োজনের বাইরের পড়াশুনার আগ্রহ ও অভ্যাস যেখানে আরো কমে গেছে। যাও সামান্য আছে তাও ইন্টারনেট, টিভি ও নানা রঙের বাজারি পত্রপত্রিকা দখল করে নিয়েছে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের নিদারুণ দুর্ভিক্ষ বর্তমান নৈরাজ্য ও অন্ধকারকে তীব্রতর করেছে। এই অবস্থায় *বিওবি*আদৌ চালিয়ে যাওয়া উচিত কিনা, তা নিয়েও কারো কারো মনে সংশয় দেখা দিয়েছে। উপরন্তু পত্রিকার জন্য লেখা সংগ্রহ করা, প্রকাশনা ও বিতরণ করার লোকের যে অভাব হবে, তাও খুবই স্বাভাবিক, বিশেষ করে যেখানে দায়িত্ব আছে, কিন্তু আর্থিক লাভের সম্ভাবনা নেই। বর্তমান লেখা, 'কিছু কথা' এই পরিপ্রেক্ষিতেই।

দুই : আমি মনে করি পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা তার মুখপত্র *বিওবি*অতীতে যা করেছে, বর্তমানে যৎসামান্য যা করে চলেছে, তা মোটেই তুচ্ছ, সার বা ব্যর্থ নয়। বেশ কিছু স্বপ্ন দেখা তরুণ ও প্রবীণ নারী-পুরুষের সময়, অর্থ ও শ্রম ব্যয়িত হয়েছে বহুবছর। এই সংস্থা ও তার পত্রিকাকে ভিত্তি করে পশ্চিম বাংলা ও তার বাইরেরও অনেকেই, আলগা হলেও, কোনও না কোনওভাবে যুক্ত ছিলেন বা আছেন। বিগত তিন দশকে একটা সুন্দর, বিশ্বাসযোগ্য ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে, যার অসীম মূল্য ও সম্ভাবনা। এটাকে ক্ষয়ীভূত বা বিনষ্ট হতে দিলে অতীত ও বর্তমানের বহুজনের শ্রম ও আশাকেই বিনষ্ট হতে দেওয়া হবে, এটা কিছুতেই সম্ভব নয়।

তিন : *বিওবি*-তে শক্তি ও গতি সঞ্চার করতে আসুন আমরা আরেকটু মন দিই, সময় দিই, শ্রম দিই, অর্থ দিই। দূরান্তের মানুষ ও গত তিন দশকে নতুন প্রজন্মের যারা আজ বড় হয়েছেন, যাদের অনেকেই আজো স্বপ্ন দেখেন, অর্থবহ ভালো কিছুর সাথে যারা যুক্ত থাকতে চান, তাদের কথা মনে রেখে আমাদের কাজকর্ম, ভাবনা-চিন্তা, পরিকাঠামো কিছু উন্নত ও যুগোপযোগী করি। আজকের উন্নত পরিবহণ-সুলভ টেলিফোন, জেরক্স, ডি.টি.পি., ই-মেল, ইন্টারনেটের সুবিধাগুলো নিয়ে সংগঠন ও পত্রিকার কাজকর্ম ঢেলে সাজা হল *বিওবি*-কে শক্তি ও স্থায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। পত্রিকা একটি পাত্রের মতো, যা হতে পারে সহমর্মী সজ্জনদের মিলনতীর্থ। এসবের জন্য কিছু আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা অবশ্যই থাকা উচিত। আর্থিক স্ব-নির্ভরতা (Self financing) অর্জনের চেষ্টা করা কর্তব্য। *বিওবি*-তে এটা একটা স্পর্শকাতর বহু বিতর্কিত বিষয়। বাস্তবানুগ না হলে আদর্শ টেঁকে না বলেই আমার বিশ্বাস।

চার : *বিওবি*-তে দেশ ও বিদেশের উপযুক্ত সাংস্কৃতিক, পরিবেশীয় ও অর্থনৈতিক আন্দোলনসমূহ মন্তব্যসহ প্রকাশিত হবে। জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন, প্রচেষ্টা, সংগ্রামকে বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরপ্রেক্ষিতে অনুধাবন করে দিকনির্দেশ করতে পারলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন শক্তিলাভ করবে। এ-কাজ বাজারি পত্র-পত্রিকা বা প্রচলিত দলীয় মুখপত্রাদির পক্ষে সম্ভব নয়, যদিও তাদের কিছু কিছু লেখা যথেষ্ট ভালো। *বিওবি*-র কাজকর্মের জন্য প্রয়োজন এমন সব মানুষের, যাদের আছে দরদী মন, নিষ্ঠা, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি। নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কর্মী, সংগঠক, চিন্তাবিদদের সাহায্য দেওয়া ও নেওয়া, তাদের যুক্ত করতে *বিওবি*-র তিনদশকের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ও আস্থার বিরাট মূল্য।

পাঁচ : পরিকাঠামোর উন্নয়ন

বিওবি'র জন্য মধ্য কলকাতার কোনও ভালো জায়গাতে দুটো বা একটা ঘর চাই। যেখানে থাকবে টেলিফোন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট। অল্প কিছু বৃত্তি (বা allowance) দিয়ে একজন বা দু-জন আংশিক সময়ের এমন কর্মী চাই, যারা *বিওবি*-কে ভালবাসে। *বিওবি*-কে মাসিক করতে হবে এবং D.T.P-র ব্যবস্থা করতে হবে।

ছয় : *বিওবি*-র স্বেচ্ছাসেবীরা মফঃস্বল ও গ্রামাঞ্চলেও

অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতা করবে। তাদের Press Card থাকবে।

সাত : *বিওবি*-র পুনর্গঠিত বিভাগসমূহ

ক. জাতি সমূহের শক্তি সম্পদের ইতিহাস :

ইওরোপ, উত্তর আমেরিকা ও জাপান, অনুন্নত বিশ্বের সব দেশ থেকেই সব বিষয়ে যে উন্নত তা স্পষ্ট ও বাস্তব। তাদের সম্পদ, শক্তি, সুন্দর পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য, উন্নত বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রেক্ষাপটে ভারতের দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য, বিনষ্ট পরিবেশ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ভয়ঙ্কর পশ্চাৎপদতা ওয়াকিবহাল সবাইকেই ভাবায় ও বিমর্ষ করে।

গত শতাব্দীতে ইওরোপ, উত্তর আমেরিকা, জাপানের বিরাট অগ্রগতির ইতিহাস এদেশের সাধারণ বুদ্ধিজীবীদেরও কম জানা। বিশেষ করে অনুধাবণীয় জাপান, সুইজারল্যান্ড, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলির ও ইজরায়েলের অসামান্য বৈষয়িক উন্নতি এবং তাদের সমুন্নত গণতন্ত্র, নারী প্রগতি, চমৎকার পরিবেশ, সুন্দর স্বাস্থ্য, আনন্দময় জীবন ও সামাজিক নিরাপত্তা। জাপান, ইজরায়েল, সুইজারল্যান্ড, স্ক্যান্ডিনোভিয়ার দেশগুলির প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ কিছু ছিল না, উপনিবেশও তাদের ছিল না। তথাপি তারা শক্তিধর ও বিপুল বিত্তশালী। তাদের প্রধান সম্পদ হল : উন্নত মানবসম্পদ ও ভালো মজবুত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো। এইসব বিষয় জানা, বোঝা ও জানানো অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

খ. অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস :

গৌতমবুদ্ধ থেকে দাদাভাই নওরোজি, বিদ্যাসাগর থেকে রমেশচন্দ্র দত্ত, বিশ্বেশ্বরাইয়া থেকে অমর্ত্য সেন প্রভৃতি নির্বাচিত মণীষীদের রচনাংশ নিয়মিত প্রকাশ করে এই প্রজন্মের মানুষের কাছে তুলে ধরা কর্তব্য মনে করি। গত দুশো বছর ধরে বহু প্রাজ্ঞ ও সজ্জন ব্যক্তিরা দরদ দিয়ে দেশের কথা ভেবেছেন, কাজ করে গেছেন। তার সুফল কাজে লাগানো প্রয়োজন।

গ. পরিবেশীয় ইতিহাস :

ভারতের পরিবেশীয় ইতিহাসের উপর যথেষ্ট ভালো কাজ আজো অনুপস্থিত। অথচ এতে একরকমভাবে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস খুঁজে পাওয়া সম্ভব। বর্তমানের ভৌতবিদ্যা, ভূবিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতির নবনব চিত্তাকর্ষক ও গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার পরিবেশীয় ইতিহাসকে আবিষ্কার ও সমৃদ্ধ করে চলেছে। আমরা তার খবর রাখি না। উন্নত দেশসমূহে বিগত কয়েক শত বছর ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা সমাজের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে এসেছে, আজ তো কথাই নেই। বিদ্যাচর্চার সুব্যবস্থা ও বিদ্বানের সমাদর চমৎকার।

ঐসব দেশে, বিশেষ করে ইওরোপে, সর্বত্র দেখা যায় সবুজ সতেজ ঘাস, যা জল, ভূমি সংরক্ষণ ও পশুখাদ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অব্যবহৃত কোনও জমিতে ময়লা বা আবর্জনা নেই, বাতাসে ধুলো নেই, মশামাছি কোথাও নেই, রাস্তাঘাটে ছাড়া-গরু-মোষ-কুকুর নেই। বিপরীতে ভারতের অবস্থা সকলেরই জানা। ওদের neighbourhood, subberb গ্রামগুলি সত্যিই অপূর্ব, সবুজ ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়।

ঘ. বিশ্বায়ন ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার অভিঘাত :

সমাজ অর্থনীতি ও রাজনীতির উপর বিশ্বায়নের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব ভারতকে কোনদিকে কতটা নিয়ে যাচ্ছে এবং নিয়ে যেতে পারে, সেই সম্পর্কিত প্রকাশিত সমীক্ষা ও তথ্যাবলী নিয়মিত প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন।

ঙ. মতাদর্শের বিতর্কমঞ্চ :

সরকার বা বড় কোনও রাজনৈতিক দল কর্তৃক অনুসৃত মতাদর্শ যদি ভ্রান্ত হয়, তবে তা একটা দেশ ও জাতির পক্ষে কী ভয়ঙ্কর হতে পারে, তা দেশবিদেশের ইতিহাসে অনেক দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের জার্মানির অনুসৃত রাজনৈতিক মতবাদ, ইউজেনিকসের অবৈজ্ঞানিক মতবাদ, ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মতাদর্শ প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা ও *বিওবি*-র সৃষ্টিই হয়েছিল বিজ্ঞানকে সমাজ ও মানবমুখী করা, আর সমাজকে বিজ্ঞানমুখী করা।

চ. সংবাদ ও মতামত

ছ. সম্পাদকীয়

মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

দায়িত্ব এড়াতে চাইলে মৃত্যু, কঠিন কাজ বাঁচা ও বাঁচানো

বিওবি-র অতীত, পটভূমি

যাত্রা শুরু করেছিল *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী* দ্বিমাসিক পত্রিকা শুধুমাত্র একটি সাময়িকপত্র হিসেবে নয়, এটি ছিল 'পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা'র মুখপত্র। 'সংস্থার' নিজস্ব একটি নিয়মবিধির লিখিত বয়ান ছিল, যাতে সংস্থার সদস্য হবার, কার্যনির্বাহী সমিতি নির্বাচিত হবার নিয়মাবলী তো ছিলই, ছিল সংস্থার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য-কর্মপন্থার নীতিনির্দেশও। সংস্থার প্রকাশনা হিসেবে পত্রিকাটি সদস্যরা বিনামূল্যে পেতেন। তবে সেইসঙ্গে সদস্য নয় এমন যে কেউও পত্রিকাটির গ্রাহক হতে পারতেন, বা কিনে পড়তে পারতেন। লিখিত নিয়মবিধি অনুযায়ী 'বিজ্ঞানকর্মী'-র সংজ্ঞা ছিল— এমন যে কেউ, যাঁর বিজ্ঞানে আগ্রহ আছে।

বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সদস্যদের মধ্যে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা বা অন্য কাজ করা 'বিজ্ঞানকর্মী'রা যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন বিভিন্ন গবেষণাগারে নিযুক্ত বিজ্ঞানী ও কর্মীরা। এর বাইরেও ছিলেন কিছু সদস্য যাঁদের কর্মস্থল ব্যাঙ্ক বা অন্য কোনও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। বিজ্ঞানে প্রথাগত বিশেষ শিক্ষা না থাকলেও *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী* তথা *বিওবি* পত্রিকার বা সংস্থার কাজকর্মে তাঁদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। কারণ মনে হয়, সংস্থা বা পত্রিকার কাজকর্ম বা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল 'বিজ্ঞান ও সমাজ', নিছক বিষয়-বিজ্ঞান নয়।

প্রায় শুরু থেকেই 'পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার' মধ্যে একটি বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়েছিল— আমাদের কাজকর্ম ভাবনাচিন্তা কি 'বিজ্ঞানকর্মীদের' পেশাগত নানা সমস্যা, অধিকার-অধিকারহীনতা, প্রভু-নিয়োগকর্তা (সে এমনকী সরকারি কোনও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হলেও), ভৃত্য-কর্মী— ইত্যাদির মধ্যে সীমিত থাকবে না কি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে একটি সর্বজনীন, বিশ্বজনীন বিজ্ঞান-সংস্কৃতির উন্মেষে ও বিকাশে। দুই-এর পরিপূরক সম্পর্ক অস্বীকার না করলেও ক্ষমতার সীমার জন্যই প্রধান ঝোঁক কোন্‌দিকে থাকবে তা বেছে নেওয়া দরকার ছিল। বলা বাহুল্য, এ বিতর্কের মীমাংসা আলোচনার মধ্য দিয়ে হয় নি। একদল 'বিজ্ঞানকর্মী' প্রথম কাজে উৎসাহী হয়ে পড়ে এবং পৃথক সংগঠন তৈরি করে। বিজ্ঞান-সংস্কৃতির প্রবক্তারা *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী* পত্রিকাকে অবলম্বন করে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসারে মনোনিবেশ করে। দুই কাজের ধারার মধ্যে মেলবন্ধনের চেষ্টাও ছিল। কিন্তু তা বেশিদূর এগোয় নি।

তাই বিজ্ঞান-সংস্কৃতিই উপজীব্য হয়ে উঠল *বিওবি*-র। অনেক ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে অবশ্য *বিওবি* একটি সাময়িকপত্রেই পর্যবসিত হল। 1990-এর দশকে এসে প্রকাশনাতে দু-একবার সাময়িক ছেদ পড়ল ঠিকই কিন্তু তা সামলে নিয়ে প্রকাশনা অব্যাহত রইল। দ্বিমাসিক থেকে ত্রৈমাসিক হল। বিগত তিন বছর ধরে ত্রৈমাসিক প্রকাশনাও রাখা যাচ্ছে না, বছরে একটি করে সংখ্যাই প্রকাশিত হচ্ছে। পত্রিকার প্রচ্ছদে আজও ঘোষণা থাকছে "পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত সমাজ ও বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকা" কিন্তু সংগঠন হিসেবে "পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার" অন্যরকম কাজকর্মে ভাঁটা পড়েছে।

1980-এর দশকে একটি স্লোগানের মতো কথা উঠেছিল— সমাজের বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে ওঠা এবং বিজ্ঞানকর্মীদের সমাজমনস্ক হয়ে ওঠা। এর মধ্যে নিহিত ছিল বিজ্ঞানের সামাজিক দায় ও বিজ্ঞানীর সামাজিক কর্তব্যের কথা, বিজ্ঞানের যৌক্তিক কাঠামো ও মূল্যবোধকে সমাজ ধারণ করতে পারার কথা। এটাই, আমার মনে হয়, ক্রমে *বিওবি*-রও মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। অন্যান্য কিছু প্রতিষ্ঠান ও সাময়িকপত্রও একই লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করে সেই সময়ে। যতদূর জানি তারাও আজ হয় ধুঁকছে, নয় উঠে গেছে।

ওঠাপড়া, ত্রুটি, সীমাবদ্ধতা সব কিছু নিয়েও *বিওবি* কিন্তু তার লক্ষ্যে মোটামুটি স্থির থেকে বিগত সাতাশ বছর ধরে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাভাষায় কোনও বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান ও সমাজ ভাবনার অপ্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ এত দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, সেই 1860 খ্রিস্টাব্দ থেকে।

আমাদের লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে অনেকটাই সচেতনভাবে আমরা প্রচলিত ছকের কোনও সংগঠনের কাঠামো এড়িয়ে চলেছি। সম্পত্তি ও তার অধিকার, পদাধিকার, কর্তৃত্ব এসব অনেকটা এড়িয়ে চলা গেছে (অবশ্য *বিওবি*-র কোনও সম্পত্তিই নেই)। 1988-89 সালে অপ্রাতিষ্ঠানিক স্বেচ্ছা উদ্যোগের নানা গোষ্ঠীর একটি সম্মিলন হয়েছিল মনে পড়বে আনেকের। সেখানে যোগ দেওয়া বিজ্ঞান ক্লাব বা "বিজ্ঞান-আন্দোলনের" গোষ্ঠীগুলির তরফ থেকে একটি

সমন্বয়-কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাব আসে। *বিওবি*'র প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাবে সায় দেয় নি। একটি লিখিত বক্তব্য পেশ করে আমরা জানিয়েছিলাম যে, আমাদের চেনা-জানা এবং চালু প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগুলি পদাধিকার কর্তৃত্বের ছকে বাঁধা, রাজনৈতিক সংগঠনের ছায়া সহজেই তাতে প্রতিফলিত হয় এবং এগুলি বিজ্ঞানের স্বাধীন চিন্তা-বিতর্ক বিকাশের নীতিকে ধারণ করতে ও এগিয়ে নিয়ে যেতে অসমর্থ। এই মুহূর্তে আমরা জানি না, কেমন সংগঠন বিজ্ঞানকে ধারণ করতে পারবে। কিন্তু কেন্দ্র-শাখায় বিভক্ত ও বিন্যস্ত কোনও কাঠামো যে বিজ্ঞান-ভাবনার প্রসারে অনুকুল নয়, তা আমরা বুঝতে পারছি। তাই আমাদের প্রস্তাব ছিল কোনও কেন্দ্রীয়-সমন্বয় নয়, তৈরি হোক স্বাধীন ও ক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলির একটি তথ্য, আদান-প্রদানের মঞ্চ, অব্যাহত থাকুক মত বিনিময় ও বিতর্ক। ইংরেজিতে বলা যায়— আমরা চেয়েছিলাম A Participatory Network of Independent Active Groups. আমাদের প্রস্তাব গৃহীত হয় নি। কল্যাণীর সম্মিলন থেকে একটি 'গনবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র' তৈরি হয়। কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনও ঝগড়াঝাঁটি বা দূরত্বও তৈরি হয় নি। সেখানে উপস্থিত কোনও কোনও গোষ্ঠী—আমাদেরই মতো — সমন্বয় কেন্দ্রের সদস্য হয় নি।

বিওবি-র বর্তমান — কেমন ও কেন?

প.ব. বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা বা *বিওবি*'র ইতিহাস পর্যালোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হলো পত্রিকা হিসেবে *বিওবি*'র অবস্থান বোঝা এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা করা যে, *বিওবি*কে বাঁচানোর চেষ্টা করা উচিত নাকি *বিওবি*-কে তার স্বাভাবিক মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে যেতে দেওয়া উচিত বা এমনকী পত্রিকাটির মৃত্যু ঘোষণাই করা উচিত?

কেন একথা বলছি? বলছি কারণ, এখন *বিওবি*'র যা অবস্থা তাতে কোনওক্রমে বছরে একটি সংখ্যা প্রকাশের জন্য জনকয়েকের প্রচুর খাটাখাটনির শেষে অনেক ভুলভ্রান্তি নিয়ে পত্রিকা বেরোয়। আগ্রহী পাঠকদের কাছেও পৌঁছয় না। প্রতিবার টাকা-পয়সা'র ও লেখার অভাবে বিড়ম্বিত হতে হয়—এ এক পীড়াদায়ক অবস্থা।

বর্তমানের এই করুণ অবস্থাটি বোঝার জন্য দুদিক থেকে ব্যাপারটি দেখা দরকার। প্রথমত, *বিওবি*'র নিজস্ব ত্রুটি, দুর্বলতা বা শক্তি-সামর্থ্যের জায়গাগুলো চিহ্নিত করা। দ্বিতীয়ত, বাইরের প্রভাব কতখানি, তা খতিয়ে দেখা। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক যে পরিমণ্ডল একটি সাময়িকপত্রের জীবনীশক্তির আধার তা যে গত বিশ-ত্রিশ বছরে ভীষণভাবে বদলে গেছে, আমরা সকলেই তা জানি, একরকমভাবে তার আঁচও পাই। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে *বিওবি* কতটা প্রাসঙ্গিক? বিজ্ঞান ও সমাজের সম্পর্কেও তত্ত্বগত ও বাস্তব যে-সব পরিবর্তন ঘটে চলেছে, *বিওবি* কি সেদিক থেকেও সজাগ? প্রথমে *বিওবি*'র আভ্যন্তরীণ ত্রুটি-দুর্বলতা-শক্তির কথাই ধরা যাক। *বিওবি* ত্রুটিমুক্ত— এমন কথা কেউ আমরা কোনওদিন চিন্তাতেও ঠাঁই দিই নি। কিন্তু সেইসব ত্রুটি-দুর্বলতা চিহ্নিত করে শোধরানোর প্রচেষ্টাও তেমনভাবে হয়নি। আমার মনে হয়, সাময়িকপত্র হিসেবে *বিওবি*তার লেখক-পাঠক-পৃষ্ঠপোষকদের কাছে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ঠিক মতো তুলে ধরার চেষ্টা করে নি। সংস্থার লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংস্থার সদস্যরা যা জানতেন, পরবর্তীকালে, সংস্থার সদস্য নন— এমন গ্রাহক-পাঠকদের কাছে তা প্রতিভাত হবার কথা নয়। তবুও, বিজ্ঞান ও সমাজের সম্পর্ক আলোচনায় অংশগ্রহণে (লেখক বা পাঠক হিসেবেও) একসময় প্রায় হাজার মানুষকে *বিওবি* পেয়েছে। আজ কেন সে সংখ্যা শ'দুইতে ঠেকেছে তার কিছু হদিস আমাদের অজানা নয়। অনেক দিন ধরেই *বিওবি*-তে প্রকাশিত রচনাদির সম্পর্কে কয়েকটি অভিযোগ রয়েছে। এক, *বিওবি* তে ভারী ভারী লেখা বেরোয় যা প্রায় দুর্বোধ্য; দুই, *বিওবি* বড় বেশি নেতিবাচক, সমালোচনা-মুখর; তিন, *বিওবি* দূর থেকে দেখার চেষ্টা করে, কাছ থেকে নয়, তাই মনে হয় জীবন-বিচ্ছিন্ন।

এসব অভিযোগের উত্তরে অনেক কিছু বলা যায়, কিন্তু বিনম্রভাবে স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, কী করে আরও সহজ ও আকর্ষণীয় করে বিষয়কে তুলে ধরা যায়, আরও জীবনের কাছাকাছি থাকা যায় বা নিয়ে যাওয়া যায়, সে-সম্পর্কে আমরা মনোযোগ ধরে রাখতে পারি নি বা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে পারিনি। এমনকী আমাদের নিজেদের মধ্যেও যে সহজ খোলামেলা আলোচনার পরিবেশ ছিল, শ্লেষ-ব্যঙ্গ-আত্মসমালোচনা গ্রহণ করায় যে ধরণের স্বাভাবিকতা, ঔদার্য ও কৌতুকবোধ কাজ করত, আজ যেন তাতে একটু টান পড়েছে। অসহিষ্ণুতা অনমনীয়তা মাথা তুলতে চায়, পত্রিকার দৈন্যদশায় তারও প্রতিফলন পড়া অসম্ভব নয়।

এখানে দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি অর্থাৎ বাইরের প্রভাবের প্রসঙ্গটি উঁকি মারছে—তাহলে কি আমাদের মধ্যে এবং আমাদের সমর্থন-জোগানোর সামাজিক ক্ষেত্রে এমন কোনও মৌলিক মানসিক পরিবর্তন ঘটে গেছে যা *বিওবি*কে অপ্রাসঙ্গিক করে

তুলেছে? প্রশ্নটা খুবই সরল, আবার গভীরও। লেখার অভাব *বিওবি*'র একটি অন্যতম সমস্যা; প্রথমদিকে এতটা ছিল না। পাঠক প্রসঙ্গেও একথা খাটে। সত্যিই তো, চারদিকে এবং নিজেদের দিকে তাকিয়ে দেখলে কি মনে হয়? লেখবার ও পড়বার সময় কোথায় মানুষের? দৈনন্দিন কাজ আছে, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার ব্যস্ততা আছে, জীবিকার শ্রম আছে, জীবনের নানা চাহিদা আছে— কষ্ট একঘেয়েমি পারিপার্শ্বিক ভুলিয়ে দেবার মতো যথেষ্ট বিনোদন আছে হাতের কাছে। শহরাঞ্চলের মানুষের কাছে প্রবল হাতছানি— এমন অনেক কিছুই এখন বিপননযোগ্য যে, তুমিও চেষ্টা করলে বিল গেটস না হোক প্রাচুর্য এবং সাফল্যের জোয়ারে ভাসতে পারো। কৌন বনেগা লাখপতি নয়, ঘরের অন্দরে স্লোগান— কৌন বনেগা কড়োড়পতি! টিভি কম্পিউটার-ইন্টারনেটও সময় দাবি করে। নতুন নানারকম পত্র-পত্রিকা-প্রচার পুস্তিকা রঙে-রসে টইটম্বুর— সেগুলোই পড়ে দেখে ওঠা যায় না, সেখানে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে ঠাসা *বিওবি*'র মতো গুরুগম্ভীর পত্রিকার ঠাঁই কোথায়? যুগের হাওয়া পরিবর্তনের কথা অন্য একটি আক্ষেপের আকারেও প্রায়ই শোনা যায়। বড়রা বলেন যে, আজকালকার ছেলেমেয়েরা কোনও ব্যাপারেই উৎসাহী নয়, বই-পত্র পড়ে না। সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করে না; তারা আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থসর্বস্ব, আর্থিক সাফল্যের ব্যাপারে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু পরিশ্রমী নয়, নিষ্ঠা নেই। তাই তো আজ তারা হরেকরকম 'পাগলামি'তে মেতে ওঠে না। বহু বহু সমাজভাবনার সংগঠন এমনকী রাজনৈতিক কাজকর্মেও আজকাল আর তরুণদের দেখা যায় না, প্রবীণদেরই সেখানে ভিড়। এমন বেশকিছু পুরনো সংগঠনও আছে, যাদের অর্থসংস্থান আছে, জায়গা আছে, ধারাবাহিক কর্মসূচি আছে। কিন্তু তা চালিয়ে নিয়ে যাবার মতো উৎসাহী তরুণ কর্মীর একান্ত অভাব। চেনা চেনা প্রবীণ মুখগুলিকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন সংগঠনের ক্ষীণ দীপ জ্বালিয়ে রাখতে সচেষ্ট দেখা যায়। অতএব তরুণ প্রজন্ম যে চেতনাহীন, সমাজবোধহীন এমন সিদ্ধান্ত অবলীলায় করে ফেলা যায়।

কিন্তু আমার মনে হয়, বহুরকম সদর্থক সমাজমুখী কাজে তরুণদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেলেও তরুণ প্রজন্ম সম্পর্কে এরকম কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না, কোথাও কিছু একটা ভুল হচ্ছে। উভয় প্রজন্ম পরস্পরকে জানতে বুঝতে না চাওয়ার একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তার কারণ কী? এ-ব্যাপারে নিরন্তর উপযুক্ত সমীক্ষা-গবেষণা দরকার ছিল, তেমন কিছু চোখে তো পড়ে না।

যাই হোক, তথ্য হিসেবে এটা অনস্বীকার্য যে *বিওবি* একা নয় আরও নানা সংগঠন ও পত্র পত্রিকাও এইরকম রক্তাল্পতায় ভুগছে। 'যুগের হাওয়া'র স্পর্শ নিশ্চয়ই আছে।

তাহলে? *বিওবি*-র অস্তিত্বের প্রয়োজন আছে কি?

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতেই পারে যে *বিওবি*'র প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এর সঙ্গে যদি আরও মনে রাখি যে, *বিওবি* বা তার মতো পত্রপত্রিকায় যে-সব বিষয়ের অবতারণা হয়েছিল সত্তর-আশির দশকে, এখন তা সংবাদপত্র ও অন্য মেইনস্ট্রিম মাধ্যমে নিয়মিত আলোচনা-সংবাদের অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজি বাংলা হিন্দি ভাষায় বিভিন্ন টিভি চ্যানেলেই তো আজ সংস্কার কুসংস্কার, পরিবেশ-পরমাণু, সামাজিক ন্যায়-উন্নয়ন এসব নিয়ে নিরন্তর অনুষ্ঠান আয়োজন হয়ে চলেছে এবং সেগুলি করছেন জলজ্যান্ত মানুষরা, আরও নানা ক্লিপিংস সহযোগে। সেদিক থেকেও মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে, *বিওবি*'র মতো মুদ্রিত-অক্ষর-নির্ভর পত্রিকা আজ প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে, তার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা প্রবল স্রোতের বিপরীতে উজান ঠেলার বৃথা প্রয়াস।

কিন্তু এরকম কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলার আগে আরও একটু তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করা উচিত।

জানু-ডিসে 2003 সংখ্যা *বিওবি*তে একজন কর্মী-পৃষ্ঠপোষক লেখকের সুদূর আমেরিকা থেকে পাঠানো *"বিওবি*'র ভবিষ্যৎ" শীর্ষক একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে। ওই লেখাটি পড়ে বেশ কয়েকজন পাঠক উদ্দীপনা বোধ করেছেন বলে জানিয়েছেন। এবং সত্যি বলতে কি শ্রীসুদীপ্ত সরস্বতীর ওই লেখা আমাদেরও *বিওবি* নিয়ে নতুন করে ভাবিত করেছে। লেখাটি যাঁরা মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন— সুদীপ্ত বলতে চেয়েছেন যে, প্রাসঙ্গিক সামাজিক আন্দোলনের আবহে এসময় *বিওবি* যে সফল ও সদর্থক ভূমিকা পালন করতে পেরেছিল, আজ সে-সব আন্দোলন স্তিমিত তাই *বিওবি*'র অস্তিত্বের সংকট দেখা দিয়েছে। শ্রীসরস্বতী অবশ্য মনে করেন যে বিওবি তা সত্ত্বেও বেঁচেবর্তে থেকে নতুনতর ভূমিকা পালন করতে পারে। কিভাবে তা সম্ভব শ্রীসরস্বতী সে সব ইঙ্গিত ব্যক্ত করেছেন ওই নিবন্ধে, বর্তমান সংখ্যাতেও তিনি সেই আলোচনা আরও প্রসারিত করেছেন। আমার কিন্তু মনে হয়েছে যে, শ্রীসরস্বতী অনেকগুলি লক্ষণ সঠিকভাবে চিহ্নিত করলেও এবং তাঁর প্রবল সদিচ্ছা সত্ত্বেও *বিওবি*কে বাঁচনোর চেষ্টা ফলপ্রসূ হবে না যদি পরিবর্তিত আর্থসামাজিক

পরিস্থিতিতে তরুণ প্রজন্মের কাছেও *বিওবি*-কে প্রয়োজনীয় করে না তোলা যায়।

বিওবি এবং তার মতো আরও অনেক উদ্যোগের আজও যে প্রয়োজন আছে এবং তা আগের তুলনায় আরও অনেক বেশি করেই, তা তাদের কর্মী-লেখক-পাঠকদের মধ্যে প্রবলভাবে উপলব্ধ হওয়াটা এইসব উদ্যোগের অস্তিত্বের অন্যতম শর্ত।

হ্যাঁ, *বিওবি* আজও প্রাসঙ্গিক, প্রবলভাবেই প্রাসঙ্গিক। সরকারি কাজে-কর্মে-প্রোগ্রামে, মেইনস্ট্রিম মিডিয়ায় বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভূমিকা এখন, বিশ-ত্রিশ বছর আগের তুলনায়, অনেক অনেক বেশি। কিন্তু সেইসবই মোটের উপর কোনও না কোনও চলতি রাজনীতি-অর্থনীতি-পন্থী, তাই সীমাবদ্ধও। যে মুক্ত প্রতর্ক, যে স্বচ্ছতা বিজ্ঞানমনস্কতার দ্যোতক, তা ভীষণভাবেই অনুপস্থিত ওইসব কর্মসূচিতে ও আলোচনায়। মূল চালিকা যেখানে নব সৃষ্ট বাজার ধরা, বাণিজ্য করা, প্রচারের আলোয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আলোকন, অবলোকন সেখানে গৌণ ও খর্ব। বিজ্ঞানের ধ্বংসাত্মক ভূমিকাই সেখানে প্রকট, উন্নয়নের নামে ধ্বংসের জয়গান।

তরুণদের পাওয়া যাচ্ছে না ঠিকই। কিন্তু তরুণ প্রজন্মের জন্য আমরাই বা কি করেছি, কি করছি? বস্তুত তরুণ প্রজন্ম বড় কষ্টেই আছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, সম্পদ-সংরক্ষণ সবদিক থেকে ভাবীকালের জন্য আমরা কোন্ উত্তরাধিকার রেখে যাচ্ছি? কোন্ সে আশার, নবজীবনের আশ্বাস? সামগ্রিক মানবিক উন্নয়নের বীজ বপনের কাজেই কি আমরা মদত দিচ্ছি নাকি ইন্ধন জোগাচ্ছি ধ্বংসে, প্রান্তবাসীদেরও ঠেলে দিচ্ছি একেবারে উপান্তে?

এ এমন এক সময় যখন অর্থ ও ক্ষমতার আন্দোলনে কোনও দ্বিধা নেই, সঙ্কোচ নেই, প্রতিবাদীরা লাঞ্ছিত বিপন্ন। ঘাতকের অনায়াস শিকার। রাষ্ট্র ধৃতরাষ্ট্র; শিক্ষার যূপকাঠে অকালে বলি হয় কত প্রাণ, মৃত্যুর মিছিল যেন। ক্রোধ প্রতিবাদ, লড়াই সংগ্রাম-আন্দোলন গুমরে মরে, পথ খোঁজে, বিপথগামীও হয়। এই অস্থিরতার মধ্যেই জীবন বহমান, সার্থকতার পথ খুঁজতে ব্যগ্র। কাজেই সংগ্রাম আন্দোলন স্তিমিত হয়েছে এমন নয়। বরং সংগ্রাম-আন্দোলনের ক্ষেত্র আজ বিকেন্দ্রিত ব্যাপক ও বিস্তৃত। *বিওবি* যদি সেগুলোকে অন্তত লিপিবদ্ধ করে রাখতেও চায়, পালটাতে হবে নিজেকে, পালটাতে হবে নীতি-পদ্ধতি দৃষ্টিভঙ্গি, অবশ্য তার স্পিরিটটাকে ধরে রেখে, তাকে অবলম্বন করেই।

কোনও আন্দোলনের হাওয়ায় ডানা ভাসানো নয়, *বিওবি*'র ক্ষেত্রে মুখ্য ব্যাপার ছিল একটি আন্দোলনের সূত্রপাতে অংশীদার হওয়া। নানা মিডিয়ায় সেগুলি আজ আলোচিত হলে একদিক থেকে আশা ও আনন্দেরই কথা। সে-সবে অংশগ্রহণ যাঁরা করছেন তাঁরা অনেকেই আমাদের পরিচিত। সেই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার, তাকে বিস্তৃত, উন্নত, প্রোথিত করার প্রয়োজন ফুরোয় নি, বরং বেড়ে গেছে।

বিজ্ঞানের কারবারীদের সমাজসচেতন হয়ে ওঠা আর সমাজের বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে ওঠায় সহায়তা জোগানের যে লক্ষ্যে *বিওবি* দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল তার কোনওই সুফল ফলেনি এমন নয়, তবে তা আশানুরূপ নয় বা প্রয়োজনের নিরিখে যথেষ্ট নয়। তার একটা কারণ, আমার মনে হয়, আমরা আমাদের সমস্তটুকু দিয়ে শুধু তাদেরই বোঝাবার প্রয়াস পেয়েছি, যাদের অধিকাংশেরই মনের দরজা-জানালা হয় বন্ধ, নয় তারা জেগে ঘুমোনোয় অভ্যস্ত। তরুণ প্রজন্মের কাছে গ্রহণযোগ্যভাবে বিজ্ঞানের ক্রিয়াপদ্ধতি, আদর্শ, তথ্য-যুক্তি নির্ভরতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি প্রসঙ্গ তুলে ধরার চেষ্ট করিনি। কারা *বিওবি*-র লেখক বা পাঠক, তা নিয়ে আমরা কী কোনও সমীক্ষা বা ভাবনাচিন্তা করেছি? আমি বা আমারই মতো কেউ লিখবে, আবার আমি বা আমারই মতো কেউ তা পড়বে, বাহবা দেবে বা সমালোচনা করবে এই দুষ্টচক্রের পরিণতি আর যাই হোক অগ্রগতি নয়। বিজ্ঞান বা তার যথাযথ সামাজিক প্রয়োগ নিয়ে বিগত ত্রিশ-চল্লিশ বছরে চিন্তা-চেতনা-প্রয়োগ সবদিক থেকে মূল ধরে নাড়া পড়েছে। সাধারণভাবে বলা যায়, আমরা বড়রা আমাদের ছক বাঁধা কাজে ও বিচারবোধে এতই ব্যস্ত ও মশগুল যে সেসবের আভাস পেলেও এড়িয়ে চলি বা চলতে বাধ্যই হই, এমনকী দিশেহারা বোধ করে অভ্যাসে ও সংস্কারে আশ্রয়, বিশ্রাম ও সান্ত্বনা খুঁজি। বিজ্ঞান সংস্কৃতির লক্ষ্য আগামীর আবাহন, তরুণ প্রজন্মদের তাতে দীক্ষা না দিয়ে সামিল না করে চলবার চেষ্টা বিরাট ভুল বলেই আমার মনে হয়েছে। *বিওবি* সেই ভুলেরও শিকার।

বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সঙ্গে কলকারখানা, শিল্প, শ্রমিক-কর্মীদের সম্পর্ক সরাসরি কিন্তু খাদ্য-পথ্য-ওষুধ মাঠ-ঘাট-জঙ্গল-কৃষিক্ষেত-আকাশ-বাতাস-জল সবেতেই আজ বিজ্ঞান প্রযুক্তির স্পর্শ। সবসময় তা শুভফলও দেয় না। শিক্ষিত সাধারণ মানুষ থেকে নানা পেশার মানুষ, কৃষক-গৃহবধু—এঁরাও সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী হতেই পারেন, আমরা আমল দিই নি বা তাঁদের আগ্রহ ধরে রাখতে পারি নি। আমরা চোখ বন্ধ করে ভরসা

রেখেছি তাদেরই উপর যারা টিভি-কম্পিউটার-ইন্টারনেট-জার্নাল ঘাঁটাঘাঁটি করেন, ইংরেজি-তথ্যভাণ্ডার যাদের করায়ত্ত এবং সেসবেই প্রাথমিক আস্থা। **বিওবি'দের বাঁচা জরুরি কিন্তু জীবন-ছুঁয়ে থাকার অবস্থান নিতে হবে।**

বিওবি-র মরা-বাঁচার প্রশ্নে ভাবতে বসে এসব কথাই মাথায় এল এবং সবকিছু বিবেচনা করে আমাদের নিজেদের মধ্যের দুর্বলতাই বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। *বিওবি*'র শক্তি ও সম্ভাবনার দিকগুলো আমরা ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারিনি। প্রয়োজনীয় উদারতা ও নমনীয়তা অঙ্গীভূত করতে পারিনি। *বিওবি* যে আজকের দিনে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক সেই বোধে আমাদের নিজেদেরই আস্থা কমে গেলে একটু দূরের বন্ধু-শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে তা কী ভাবে সঞ্চার করব?

কিন্তু শুধু কথায় তো চিড়ে ভিজবে না, সামগ্রিক একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা রূপায়ণের নিষ্ঠা দেখানো দরকার। ছকে বাঁধা পড়া এড়িয়ে চলার জন্যও যে কিছুটা শৃঙ্খলার প্রয়োজন আছে সেটা আমি উপলব্ধি করছি। সেই উপলব্ধি নিয়ে বাক্যজাল থামিয়ে বরং সেই পরিকল্পনার ছকটাই তুলে ধরা যাক।

এক : নীতিগত অবস্থানটা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করা

বিওবি-তে কারা হতে পারেন অংশগ্রহণকারী? কাদের জন্য *বিওবি*? *বিওবি*-তে স্থান পাবে কী ধরণের বিষয়? পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার মুখপত্র হিসেবে সূচনা করলেও আজ *বিওবি* একটি বিশেষ সাময়িকপত্র হিসেবেই স্বনামে পরিচিত। অথচ পত্রিকার লক্ষ্য উদ্দেশ্য কর্মপন্থা আমরা স্পষ্ট করে তুলে ধরি নি কোনওদিন। নতুন করে চলতে চাইলে সেটি করা দরকার। আমার প্রস্তাব:

বিওবি হোক লেখাপড়া জানা এমন সব সাধারণ মানুষের জন্য, যারা চোখ-কান-বিচারবোধ মুক্ত রেখে এবং প্রয়োগ করে জীবনচর্চায় নিরত থাকতে চান, যারা সমাজজীবনকে উপেক্ষা না করেও নিজের জীবন তো বটেই সেই সঙ্গে পারিপার্শ্বিককেও প্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান এমন সমস্ত "অ্যাকটিভিস্ট" দের জন্য। *বিওবি*'র পক্ষপাতিত্ব সেইসব মানুষদের প্রতি যারা ভাগ করে ভোগ করতে প্রস্তুত হতে চান যুক্তি, তথ্য ও খমতার উপকরণে সিদ্ধান্ত নিতে চান। ইরেজিতে শোনায় ভালো— **sharing caring and informed humans.** অ্যাকটিভিস্ট তথা কর্মী মানুষ তাঁরাই যাঁরা যাচাই করে তথ্য বেছে নিতে চান এবং দৈনন্দিন জৈব-অস্তিত্বের একটু অন্তত পেছনে সামনে দূরে দেখতে চান। *বিওবি* স্বাধীনতা সাম্য সহযোগিতা বৈচিত্র্য সম্পর্ক সহযোগিতা শান্তি ও প্রগতির পক্ষে, জীবনের উন্নয়নের পরিবেশের ধারাবাহিকতার পক্ষে। নব নব উন্মেষের পক্ষে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের জন্য এ-পৃথিবীকে বাসযোগ্য রেখে যাবার মরমী সংগ্রামীদের পক্ষে। কাদের জন্য *বিওবি*—এই প্রশ্নের সহজ ও স্পষ্ট উত্তর যদি হয়, সাধারণ শিক্ষিত মানুষের জন্য, তরুণদের জন্য, তাহলে দুর্বোধ্যতার অপবাদ ঘুচে যেতে দেরি হবে না, নানাধরণের লেখা পাবার সম্ভাবনাও বাড়বে।

দুই. ব্যবহারিক নীতির কিছুটা পরিবর্তন ও প্রসার

কোনও প্রত্যক্ষ সশস্ত্র বিপ্লবের অংশীদার নয় *বিওবি*। বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করে তার মধ্যেকার ইতিবাচক প্রবণতাগুলিকে চিহ্নিত করা এবং কাজে লাগানোই *বিওবি*'র বাঁচার অন্যতম শর্ত। সেখানেও কিছু পরিবর্তন দরকার। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে *বিওবি* কি এরকম কোনও অবস্থান নিতে পারে?

এক. আন্দোলন সংগ্রাম লড়াই-এর ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে। আমাদেরও ক্ষুদ্র বৃত্ত থেকে বেরোতে হবে তবেই নতুন আলো লাগবে চোখে মুখে গায়ে। সে প্রয়াস হয়েছে ঠিকই কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে।

দুই. প্রযুক্তির সাহায্য নিতে হবে, মানবিক সম্পর্ক এবং সৃষ্টিশীলতার বিকল্প হিসেবে নয়, সেগুলি ধরে রাখা এবং বিকাশের জন্য। একসময় যাঁরা ছিলেন বন্ধু শুভানুধ্যায়ী এই মুহূর্তে তাঁরা হয়তো সময় দিতে পারছেন না। হয়তো কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যে আছেন তাঁরা, অনেকে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে নিজেদের হয়তো যুক্ত করেছেন। যেসব নিয়ে তাঁরা ভাবিত-মথিত, সেইসব মনন-চিন্তন অনুশীলনের মাধ্যম কি হতে পারে না *বিওবি*? তাঁরা যখন যেটুকু পারবেন, সেটুকু গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করতে হবে।

তিন. তথ্যকে স্বীকার করে ভুল শোধরানোয় বা আত্ম-সমালোচনায় বিমুখ হলে চলবে না।

চার. সহজে টু-পাইস কামানোর পন্থার হদিস দেওয়া বা এটা-সেটায় চটজলদি দাওয়াই বাতলানোর মতো 'উপযোগিতাবাদী' হবে না ঠিকই *বিওবি* কিন্তু ব্যক্তি ও সমাজজীবনে উৎকর্ষতার সন্ধানে উপযোগী ভূমিকা পালন করতে পারা উচিত।

পাঁচ. বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে উঠে বন্ধু-সহ-সংগ্রামীদের চিনে নিতে পারা চাই। যখন আলো কম, আঁধারে ওৎ পেতে থাকে

নানারকম আক্রমণ তখনও যদি হাত ধরাধরি করে চলতে না পারি তবে তা প্রত্যয়ের শিথিলতা, ভাবীকাল ও প্রজন্মের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতারই ইঙ্গিত।

আমরাই সঠিক পথের ঠিকাদার এই আত্মম্ভরিতা আত্মহত্যার সামিল এবং উদাহরণ বিস্তর। অল্প সংখ্যক মানুষের প্রচুর শ্রম ও সময় নয়, বিওবি চলুক অনেক মানুষের অল্প অল্প শ্রম ও সময় আত্মসাৎ করে।

তৃতীয় প্রয়োজন— একটি প্রকল্প ও তার বাজেট

অপ্রিয় হলেও প্রসঙ্গটা এড়ানো যাবে না। একটি পরিকল্পনা নিয়ে চলার অঙ্গীকারের অঙ্গ হল আগাম আঁচের ছক—কোথা উঠবে খরচ, কিভাবে হবে কাজকর্ম। আমার প্রস্তাব—জানুয়ারী ২০০৫ থেকে শুরু করে দুবছরের জন্য নেওয়া হোক এরকম একটি 'নবরূপায়ণ' প্রকল্প। সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাব নীচের তালিকায় দেওয়া গেল:

ব্যয়-আয়ের খাত [পাঁচ বছরের ব্যয়-আয় (টাকা)]

ব্যয়		আয়	
1. একটি অফিস ঘর, আনুমানিক 200-500 বর্গফুটের মাসিক ভাড়া, 2000 টাকা, 24 মাসের	48,000/-	1. পত্রিকা বিক্রি 400 কপি, 10 টাকা করে (কমিশন বাদে, এখনকার দাম 15 টাকাই রেখে)	32,000/-
2. একজন সহযোগী কর্মী, যিনি অফিস সামলাবেন (সপ্তাহে তিন-চার দিন, প্রতিদিন গড়ে চার ঘন্টা) এবং যোগাযোগের কাজ করবেন, মাসিক জীবিকাসহায়তা 1000 টা,	24,000/-	2. বিজ্ঞাপন সংগ্রহ 2000 টাকা/সংখ্যা	16,000/-
3. একটি কম্পুটার, প্রিন্টার সহ (পত্রিকার ই-মেল, ওয়েবসাইট তো থাকবেই, কম্পোজের কাজ টাও করা যেতে পারে)	50,000/-	3. বার্ষিক গ্রাহক 200 জন, 50 টাকা/গ্রাহক	20,000/-
4. ত্রৈমাসিক বিওবি'র আটটি সংখ্যা (40-50 পৃষ্ঠা, 1000 কপি)	100,000/-	4. সহযোগী-শুভানুধ্যায়ীর বার্ষিক অনুদান/ সাহায্য/বিনাসুদ- ঋণ (100 টাকা থেকে 2000 টাকা পর্যন্ত বার্ষিক গড়ে 1000 টাকা বছরে 50 জন ধরে একটি বিওবি-বান্ধব তহবিল গড়ে তোলার মাধ্যমেও কাজটি করা যেতে পারে)	100,000/-
5. পত্রিকা, প্রকাশিত বই এবং নির্বাচিত বইও অন্যান্য উপকরণ (যেমন, সিডি, ছবি, পোস্টার, ব্যাজ ইত্যাদি নিয়ে জেলা বা স্থানীয়স্তরে বইমেলায় অংশগ্রহণ, এক-দুজন স্বেচ্ছাকর্মীর রাহাখরচ (বছরে 5-6টি করে), প্রতিবার খরচ 1000টা	10,000/-		
6. এ যাবৎ প্রকাশিত রচনাদির সংকলন প্রকাশ (সম্পাদিত ও সংযোজিত), প্রস্তুতি খরচ	3,000/-		
মোট খরচ	2,35,000/-	**ঘাটতি**—(2 বছরে)	67,000/-
		মোট আয়	1,68,000/-

পত্রিকা-সংখ্যা পরিকল্পনা

কেমন হবে নতুন বিওবি'র রূপ? প্রস্তাব :

বিশ্লেষণধর্মী লেখা (এখনকার মতো)-1টি/2টি	6 পৃ.
আমন্ত্রিত/অনুবাদ রচনা	5 পৃ.
রির্পোট-সমীক্ষা (উন্নয়ন, পরিবেশ, কৃষি শিল্প বিজ্ঞান, সংস্কৃতি-দেশে, বাইরে)	8 পৃ.
স্বাস্থ্য শিক্ষা জীবিকা ইত্যাদি-ব্যবহারিক আলোচনা	4 পৃ.
ভবিষ্য-দর্শন (কল্পনাশ্রয়ী প্রক্ষেপণ)	2 পৃ.
ছোটদের বিভাগ (প্রকৃতি-পাঠ;সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষা, শব্দদৃশ, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি)	3 পৃ.
পুস্তক-পত্রপত্রিকা-পরিচিত-পর্যালোচনা	2 পৃ.
বিজ্ঞাপন	3 পৃ.
ছবি, স্কেচ, কার্টুন, ইত্যাদি (মোট জায়গার15-20%)	5 পৃ.
পত্রিকা সংখ্যা-পরিচয় (ইং- ওয়েবপেজ)	1 পৃ.
বাড়তি জায়গা (নমনীয়)	1 পৃ.
মোট	40 পৃ.

নবরূপ-প্রচেষ্টায় বিওবি'র নাম পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হতে পারে। তবে তা আপাতত স্থগিত রাখাই শ্রেয় মনে হয়।

শেষের কথা, শেষ কথা নয়

বাজেট দেখে মনে হতে পারে-স্বপ্ন দেখছি। হ্যাঁ তাই, তবে আমার মনে হয় বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়েই এই স্বপ্ন দেখা যায়। নিয়মিত প্রকাশ ও যোগাযোগ থাকলে অতীতে আমাদের যাঁরা পাঠক-গ্রাহক-বন্ধু-শুভানুধ্যায়ী ছিলেন তাঁদের কাছ থেকে সাড়া পাব বলে আমার বিশ্বাস। তবে টাকাপয়সা লেন-দেন ইত্যাদির পন্থা সহজ করতে হবে। প্রতিটি ইতিবাচক সাড়ার স্বীকৃতি দিতে হবে।

বিভিন্ন খাতে আয়ের অঙ্ক বাড়তেই পারে। তাছাড়া সহমর্মী সংস্কৃতিকর্মীদের সহযোগিতায় উপযুক্ত অনুষ্ঠান (যেমন গান, নাটক, চলচ্চিত্র ইত্যাদি)-প্রদর্শনীর মাধ্যমেও কিছু অর্থসংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়ার যেতে পারে। সামাজিক ভিত্তি দৃঢ় না হওয়া পর্যন্ত বিদেশ সূত্রে অনুদান বা কোনও ব্যক্তিগত বড় দান আমাদের গ্রহণ করা উচিত নয় বলে মনে করি।

আমাদেরই মতো অবস্থানে আছেন এমন পত্রিকা-প্রকাশনার সঙ্গে আদান-প্রদান, সম্পদ সংগ্রহে যৌথ উদ্যোগ, এবং ভাগাভাগি সদ্ব্যবহারের কিছু দিক উন্মোচিত করতে পারলে, খরচও খানিকটা কমানো সম্ভব। যেমন, কম্পিউটার যৌথভাবে কেনা ও ব্যবহার করাই যায়। জেলা-মফস্বলে বইমেলা ইত্যাদিতে যৌথভাবে অংশগ্রহণ করা যায়। পত্রপত্রিকা বিপণন-বিতরনেও যৌথ প্রয়াস অংশগ্রহণকারী সকলের পক্ষে শুভফলদায়ী হতে পারে। একটা কথার এখানে উল্লেখ করতে চাই। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোনওক্রমে বেঁচেবর্তে আছে এমন বেশ কিছু সংখ্যক পত্র-পত্রিকার মধ্যেই বিষয়ে-বক্তব্যে ফারাক অনেক কমে এসেছে। বিচ্ছিন্নভাবে না চলে পরিপূরকভাবে মেলবন্ধন গড়ে উঠলে সম্মিলিত আওয়াজ অনেকদূর বিস্তৃত হতে পারে। সংগতির পার্থক্য এমনকী মতপার্থক্য সত্ত্বেও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাযুজ্যের ভিত্তিতে এবং পারস্পরিক নিষ্ঠা ও সততার উপর আস্থা রাখতে পারলে, মানুষের পক্ষেও আস্থা স্থাপন সহজ হয়।

দুবছরেরর আন্তরিক প্রচেষ্টাতেও যদি আশানুরূপভাবে গুছিয়ে উঠতে না পারা যায়, সহযোগীদের কাছে মার্জনা চেয়ে নিয়ে, উদ্যোগে ইতি টানা যাবে।

রবীন মজুমদার

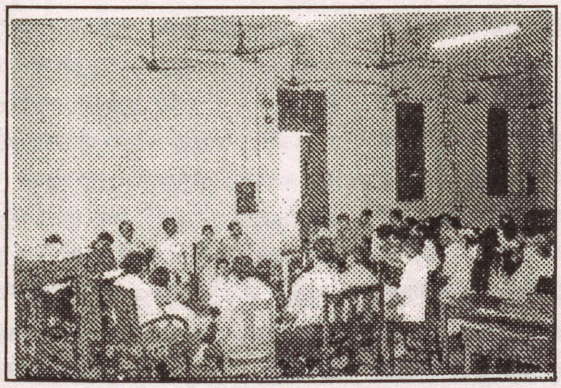

এই প্রতিবেদন ছাপার সময় পর্যন্ত *বিওবি* বাঁচানোর উদ্যোগে সামান্য হলেও গতির সঞ্চার হয়েছে। প্রতিশ্রুত কাজে সহায়তায় অনেকেই এগিয়ে এসেছেন বা আসছেন। পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে বা অন্যান্য বিষয়ে কাজ কিছুটা হলেও এগিয়েছে। এছাড়া সাপ্তাহিক আড্ডা নির্ধারিত সময়ে প্রতিদিনই বসেছে এবং অনেকেই নিয়মিতভাবে যাতায়াত করছেন। এছাড়া আগামী বছরের কাজকর্ম সংক্রান্ত কিছু কিছু কাজ বাস্তবায়িত করার একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। **স.ম.**

Space Donated by :

A Well Wisher

স্পঞ্জ আয়রন কারখানা
স্পঞ্জের মতোই শুষে নিচ্ছে মাটির তলার জল

ধাতব লোহা তৈরির এক সহজতর পদ্ধতির প্রচলন ঘটছে দ্রুত। আন্তর্জাতিক বাজারে লোহা-ইস্পাতের তেজি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতেও এই পদ্ধতিতে লোহার আকরিককে ধাতব লোহায় পরিণত করার বেশ কিছু— 30টির বেশি কারখানা গড়ে উঠেছে বিগত বছর পাঁচেকের মধ্যে। বেশিরভাগই স্থাপিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষত দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলকে ঘিরে। দুর্গাপুর ও তার আশপাশে ইতিমধ্যেই 20-22 টি কারখানা গড়ে উঠেছে। এইসব কারখানার উৎপাদিত পণ্য হলো প্রায় আশি শতাংশই ধাতব লোহার ছোট ছোট টুকরো। কঠিন অবস্থাতেই অক্সাইড যৌগ আকরিক বিজারিত হবার সময়ে এগুলির ভেতর দিয়ে প্রচুর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বেরোনোর ফলে এগুলি বেশ হাল্কা এবং সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত তাই এর নাম স্পঞ্জ আয়রন। লোহার তৈরি নানা পণ্য, ইস্পাত ইত্যাদির জন্য স্পঞ্জ আয়রন যথেষ্ট সমাদৃত। শিল্পমহলের আনাচেকানাচে শোনা যায় যে, গত পঞ্চাশ বছরে ভারত যে পরিমাণ লোহা উৎপাদন করেছে, আগামী পাঁচ বছরেই উৎপাদন হবে তার চেয়েও বেশি।

নতুন করে লৌহশিল্পে জোয়ার এলে খুশি হবার কথা। কিন্তু তা হওয়া যাচ্ছে না। এই শিল্পগুলি সঙ্গে করে এনেছে কিছু অশনিসংকেত—দূষণ ও প্রকৃতি নিধন— যার ফলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে আশপাশে বসবাসকারী মানুষ, এমনকি কারখানাগুলিতে কর্মরত শ্রমিকদের জীবন। দুর্গাপুরের মানুষজনের উদ্যোগে গড়ে উঠেছে একটি সংস্থা 'বসুন্ধরা'। তাঁরা কলকাতার 'নাগরিক মঞ্চ'কে স্পঞ্জ আয়রন কারখানাগুলির দূষণ ও শ্রমিকদের দুরবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন। নাগরিক মঞ্চ কলকাতায় একটি আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করেন। বসুন্ধরার কর্মীরা সহ অনেকগুলি সংগঠনের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে আলোচনার শেষে ঠিক হয় যে, কলকাতা থেকে একটি প্রতিনিধিদল দুর্গাপুর যাবেন। সেই অনুযায়ী বিগত 11-12 ডিসেম্বর নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে এবং বসুন্ধরার আতিথেয়তায় আটজনের একটি দল দুর্গাপুরে যান এবং একটি স্পঞ্জ আয়রন কারখানা-সহ আশেপাশের কিছু এলাকাও পরিদর্শন করেন। প্রাথমিকভাবে তাঁরা চাক্ষুষ যা দেখে এসেছেন তা রীতিমতো বিচলিত হবার মতো। কারখানাগুলিতে বেশিরভাগ শ্রমিকই ঠিকাদারের কর্মী, এবং বিপজ্জনক কর্মক্ষেত্রে কাজ করার জন্য যে-সব ব্যক্তিগত ও সামূহিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত তার প্রায় কিছুই নেই। সাপ্তাহিক ছুটি বা অন্যান্য শ্রমিক কল্যাণ ব্যবস্থাও কিছু নেই বললেই চলে। বারো ঘণ্টার কাজের দিন মজুরিও অর্ধেক— দৈনিক 50-60 টাকা। আশপাশের এলাকায় ধুলো-ধোঁয়ার প্রাদুর্ভাব বেড়েছে প্রচণ্ড, স্বাস্থ্যহানির লক্ষণ প্রকট। শিশুদের মধ্যেও শ্বাসকষ্ট, চুলকানি ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব বেড়েছে। বাড়িঘরের সর্বত্র কালো গুঁড়োর আস্তরণ, এমনকী পুকুর ও কুয়োর জলের উপরেও কালো সর। গ্রামের মানুষজন জলের দূষিত হওয়া নিয়ে এবং আরও বেশি করে মাটির তলার জলের অভাবে আতঙ্কিত। ধান ও অন্যান্য ফসলের ফলনও 25-30 শতাংশ কমেছে এক-দু বছরের মধ্যেই। দুর্গাপুর শহরের খুব কাছেই নামো সগরডাঙ্গা গ্রামে গিয়ে কলকাতার অতিথিরা এ-সব প্রত্যক্ষ করলেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, একযোগে অনেকগুলি সাব-মার্সিবল পাম্পের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ জল স্পঞ্জের মতোই শুষে নিচ্ছে স্পঞ্জ আয়রন কারখানা।

দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যালটি, আসানসোল-দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, রাজ্যের ও জেলার বিভিন্ন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কত কি-ই তো আছে। তাঁরা অনেকেই সম্যক ওয়াকিবহাল নন। যেমন দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যালিটি জানে যে, ভূগর্ভস্থ জল তোলার কোনো অনুমোদন কোনো কারখানাকে দেওয়া হয়নি, কিন্তু জানেন না এক্ষেত্রে কী করণীয়। ব্যক্তিগতভাবে কেউ-কেউ কারখানার আভ্যন্তরীণ অনিয়ম এবং আশপাশের দূষণ সম্পর্কে কিছু আইনী পদক্ষেপ নেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দু-একপা এগিয়েই তাঁদের থেমে যেতে হয়েছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে আমরা বার বার অঙ্গীকার করেছি যে উন্নয়ন করতে হবে প্রকৃতি-পরিবেশকে ধ্বংস না করে, শিল্পের সমৃদ্ধির জন্য গরিব মানুষদের জল বাতাস মাটি ও অন্যান্য

প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস হতে দেওয়া যাবে না ইত্যাদি।

কিন্তু কেন তাহলে স্পঞ্জ আয়রন উৎপাদনের নামে সাধারণ নাগরিক ও নিরাপত্তা ও দরিদ্র গ্রামবাসীদের এই দুরবস্থা?

কেন সুরক্ষার আইনী সংস্থান পদদলিত করে কারখানাগুলিকে চলতে দেওয়ার এই উৎসাহদান? কার লাভ হবে এতে আখেরে?

র.ম.

তবু মাটি ছাড়বে না ওড়িশার কাশীপুরের মানুষ

ঠিক হয়েছিল বক্সাইট খনি ও অ্যালুমিনা তৈরির কারখানা বসবে উড়িষ্যার রায়গড়া জেলার কাশীপুরে। সেই 1993 সালে। কয়েকটি বিদেশী কোম্পানির সাথে ওড়িশা সরকারের চুক্তি হয়। দেশী কোম্পানি হিসাবে ছিল আদিত্য বিড়লা গ্রুপ। তৈরি হয় উৎকল অ্যালুমিনা ইন্টারন্যাশানাল লিমিটেড (UAIL)।

জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হতেই বাধা আসে স্থানীয় আদিবাসী জনসাধারণের দিক থেকে। তাদের বক্তব্য খনি ও কারখানা হলে তারা বাস্তুচ্যুত হবেন। আশপাশের জমি উর্বরতা হারাবে। কারখানার বর্জ্য দ্রব্যে দূষিত হবে তদের জলের উৎস। ধ্বংস হবে সংলগ্ন বনভূমি।

সরকার এসব কথায় কান দেয়নি। প্রতিরোধ ভাঙতে পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনী কাজে নামে। বাধা পেয়ে মানুষও সঙ্ঘবদ্ধ হয়। গড়ে ওঠে প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষা পরিষদ। তাদের এক প্রতিবাদ সমাবেশে গুলি চালায় পুলিশ। দুহাজার সালের ষোলোই ডিসেম্বর আহত হয় অনেকে। মারা যায় তিনজন। অভিলাস, দামোদর ও রঘুনাথ। এর পর থেকে প্রতিবছর ষোলোই ডিসেম্বর পালিত হয় শহীদ স্মরণ দিবস হিসেবে।

এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কারো শাস্তি হয়েছে বলে জানা যায়নি। এই ঘটনার জেরে নরওয়ের কোম্পানি নর্স্ক হাইড্রো এই উদ্যোগ থেকে সরে যায়। এই সুযোগে কানাডার অ্যালক্যান তাদের অংশ বাড়িয়ে পঁয়তাল্লিশ শতাংশ করে নেয়।

দুহাজার চার সালে খনির কাজে সরকারের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। দুহাজার পাঁচ সালেই শুরু হোক খনির কাজে— চাইছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ফলে পুলিশি উৎপীড়ন বৃদ্ধি পায়। খনি এলাকায় প্রবেশের রাস্তা তৈরি হয়। পুলিশ বাহিনীর অবস্থান পাকা করতে নির্মিত হয় পুলিশ ছাউনি।

এই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এক বিক্ষোভ সমাবেশ হয় গত পয়লা ডিসেম্বর। শ'চারেক মানুষ হয় তাতে। সমাবেশকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠি চার্জ করে ও টিয়ার গ্যাস শেল ছোঁড়ে। পুরুষ-মহিলা মিলে ষোলোজন আদিবাসী আহত হয়। পুলিশের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাত-ই ডিসেম্বর এক প্রতিবাদ মিছিল হয় আশপাশ গ্রামের মানুষের উদ্যোগে।

এরপর আসে ষোলো-ই ডিসেম্বর শহীদ স্মরণ দিবস। যে উপলক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের জমায়েত হওয়ার কথা। জমায়েত রুখতে বদ্ধপরিকর রাজ্য প্রশাসন বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়োগ করে। নেতৃত্বে থাকেন জেলার কালেক্টর এবং পুলিশ সুপার, আস্তানা গাড়েন কাছাকাছি শহর টিকিরিতে।

বিভিন্ন বামপন্থী দলের একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলের এই সমাবেশে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। (UAIL)-নিযুক্ত গুণ্ডা বাহিনী তাদের বাধা দেয় এবং পরে পুলিশ এই প্রতিনিধি দলকে পুলিশ চৌকিতে আটকে রাখে। এই প্রতিনিধিদলে উড়িষ্যা বিধানসভার তিনজন বামপন্থী এম. এল. এ. ছিলেন। ছিলেন এই আন্দোলনের সমর্থনে গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক গ্রুপ অ্যালকান্ট Alcant -এর পক্ষে লন্ডন থেকে আসা চারজনের প্রতিনিধি দল। UAIL-এর গুণ্ডাবাহিনীর লোক ওই দলের ড. মার্টিনেজ আলিয়ের পাশপোর্ট কেড়ে নেয়। ড. মার্টিনেজ ওখানকার সর্বজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ভগবতপ্রসাদ রথের জ্যাতিথ্য নিয়েছিলেন। এই কারণে পুলিশ অধ্যাপক রথকেও হেনস্থা করতে ছাড়েনি।

পুলিশের এত প্রতিরোধ সত্ত্বেও শহীদ দিবসে মানুষের মিছিল রদ করা যায়নি। অন্যূন্য ছ'সাত হাজার মানুষ হাজির হয়েছিলেন ওই সমাবেশে।

এই আন্দোলন সম্পর্কে আরও

তথ্য জানতে এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন। independent media@imail.com> <alcantinindia@yahoo.com, http://www.saanet.org/kashipur। এই আন্দোলন সম্পর্কে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করেছিলেন বিজু টোপ্পা এবং মেঘনাদ। নাম : *Devlopment Flows from the Barrel of the Gun*। এই সিডিটি সংগ্রহের জন্য এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন। <akhra@rediffmail.com>।

তথ্যসূত্র :

independent media প্রেরিত সংবাদ।

রবীন চক্রবর্তী

ক্ষেপণাস্ত্রের পেছন গুঁতো

গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই আমাদের দেশ বিভিন্ন পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ চালিয়ে আসছে। আকাশ নামের এই স্বপ্ন পাল্লার, স্থলভাগ থেকে আকাশে চলমান গাড়ি থেকে উৎক্ষেপণ যোগ্য এই যন্ত্রটির এক সপ্তাহে দুবার পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করা হলো। এই ক্ষেপণাস্ত্রটি 25 কিমি দূরত্বে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুকে আঘাতে সক্ষম এবং প্রায় 55 কিগ্রার মতো বিস্ফোরক বহন করতে পারে।

প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানও ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার বিষয়ে পিছিয়ে নেই। তারাও হাট্‌ফ-তিন গাজনভি ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালিয়েছে। তাদের ক্ষেপণাস্ত্রটি স্থলভাগ-থেকে স্থলভাগে উৎক্ষেপণ-সক্ষম এবং এর পাল্লা হলো 290 কিমি, দুটি দেশই অবশ্য বলছে যে, তাদের এই পরীক্ষার বিষয়টি প্রায় একবছর আগেই ঠিক করা ছিল, আকস্মিকভাবে দুদেশই একসঙ্গে পরীক্ষা চালিয়েছে। এছাড়াও গত অক্টোবরে চাঁদিপুরের ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ার স্থল থেকে ভারত পৃথ্বী-তিন-এর সফল পরীক্ষা চালিয়েছে। এই ক্ষেপণাস্ত্রটি মধ্যপাল্লার। এর পাল্লা হলো দুশ পঞ্চাশ থেকে তিনশো কিলোমিটার।

যখনই এইসব পরীক্ষা শুরু হয় তখনই স্থানীয় মানুষদের দুর্গতির অন্ত থাকে না। এইবারেও পৃথ্বীর পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণের জন্য উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের আশপাশের গ্রাম থেকে দুশো সাতাশটি পরিবারের প্রায় দুহাজার মানুষকে তাদের বাড়ি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। প্রায় ছশো জন শিশুও তার মধ্যে আছে। 1988-র প্রথম পরীক্ষার পর থেকেই ওই অঞ্চলে এই পরীক্ষার কারণেই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বিপুল। আবাদী জমি বরবাদ হওয়ার বিষয়টি বাদ দিলেও সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত ও পরিহারযোগ্য মৃত্যুর আনাগোনা ওই অঞ্চলের নিত্যদিনের সাথী। বিস্ফোরণের পরে লোহার ধাতুর টুকরো সংগ্রহ করতে গিয়ে গরমে পুড়ে মৃত্যুর বিষয়টি অতি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এছাড়া অবিস্ফোরিত অংশের আকস্মিক বিস্ফোরণ, আলোর তীব্র ঝলকের জন্য চোখের ক্ষতি, তীব্র মাত্রা এবং উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দের ফলে স্বাস্থ্য হানি অতি স্বাভাবিক বিষয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে পরীক্ষা সফল হয়নি এবং বহু অর্থ অযথা ব্যয় হয়েছে।

এক সময়ে চাঁদিপুরের ভোগরাই অঞ্চলে উৎক্ষেপণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ ছিল, কিন্তু সেই প্রতিরোধ আজকে অনেকটাই স্তিমিত হয়ে গেছে।

শুভাশিষ মুখোপাধ্যায়

ব্যতিক্রমী কিছু পুস্তক পুস্তিকা পত্রিকা

নিউক্লিয়ার বোমা নয় ❑ রাষ্ট্রসংঘের মানবিক অধিকারের ঘোষণা

পরিবেশ দূষণ : পরিচিতি ও পরিমাপ ❑ পরিবেশ আইন-কানুন

হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান ❑ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শিক্ষা

পরিবেশবিদ্যা পরিচয়

(কলকাতা, কল্যাণী, বর্ধমান, বিদ্যাসাগর, বিশ্বভারতী ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের পাঠ্যসূচী অনুসারে লিখিত, কিন্তু অ-ছাত্র পাঠকদের দ্বারাও সমাদৃত)

অর্থনীতি সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা **কালধ্বনি**

পাওয়া যাবে দুহাজার পাঁচ-এর কলকাতা বইমেলায় *বিওবি*-র স্টলে ও অন্যত্র।

প্রকৃতিবান্ধব চাষাবাদ প্রসঙ্গে

ভারতের প্রথাগত চাষব্যবস্থা ছিল বৃষ্টি-নির্ভর। বছরে একবারই ধান হতো, জমি-জল ও জঙ্গল সবই প্রচুর ছিল। মাটির উর্বরতাও ছিল। ব্রিটিশ আমলে কৃষির ব্যাপক পরিবর্তন হয়। ব্যবসায়িক ফসলের উৎপাদন বাড়ানো হলেও স্থানীয় খাদ্য চাহিদাকে তেমন পাত্তা দেওয়া হয় নি। এসব সত্ত্বেও, দেশে খুব কম ধান হতো না, হান্টার সাহেবের বইতে লেখা আছে যশোরে বিঘায় ধান ফলত বারো মণ আর মালদায় দশ-বরো মণ। চাষ হতো সাবেকি পদ্ধতিতেই। কিন্তু, দেশের লোক না খেয়ে মারা যেতেন। কারণ প্রশাসনিক, চাষের দোষে নয়।

না খেতে পেয়ে মারা যাওয়ার প্রশাসনিক দক্ষতাকে সঙ্গে নিয়েই স্বাধীন হল ভারত, কিন্তু, দোষ পড়ল উৎপাদন পদ্ধতির, চাষের এবং অবশ্যই জনসংখ্যার উপর। এল সবুজ বিপ্লব। যার সূচনা হয় 1966 - 67 সালে, উচ্চ সংবেদনশীল (যা সাধারণভাবে উচ্চফলনশীল নামে পরিচিত) গমের চাষ দিয়ে। সবুজ বিপ্লব সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সার, কীটনাশক প্রভৃতির উৎপাদন এবং জমিতে তার ব্যবহার উভয়ই পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে। সবুজ বিপ্লবের সাফল্য হিসেবে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি খুব জোরের সঙ্গে প্রচার করা হলেও, এর ফলে আজ 'জমির' কি হাল বা জনস্বাস্থ্যে এর প্রভাব কিরকম—তা কিন্তু কখনই প্রচার করা হয় না।

সবুজ বিপ্লবের সাফল্যের পাশাপাশি ক্ষতির দিকটিও দেখা দরকার, খোঁজা দরকার বিকল্পেরও। সেই জরুরি কাজটিই করেছেন লেখক দেবল দেব, তাঁর সদ্য প্রকাশিত *ইনডাস্ট্রিয়াল ভার্সেস ইকোলজিক্যাল এগ্রিকালচার* নামক বইটিতে। 'সবুজ বিপ্লবে'র অন্ধ উন্মাদনা শেষ করেছে জীববৈচিত্র্য, বিশেষ করে ধানকে, 'জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং'-এর সাহায্যে প্রায় সবরকমের ফসল/খাদ্যশস্যের জিনগত চরিত্র বদলে দেওয়া হচ্ছে মাত্রাহীন ফলনের লোভে। কিন্তু ফলন বাড়ছে কি ধানের, তৈলবীজের বা টম্যাটো আলুর? লেখকের পরিশ্রমলব্ধ গবেষণার উত্তর 'না'। নতুন প্রযুক্তির এই চাল, গম, তেল খেয়ে শরীরে দেখা দিতেই পারে মারাত্মক ব্যাধি। নিশ্চিত নন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা। সবুজ বিপ্লব ধনী চাষিকে আরো ধনী করেছে। একরের পর একর জমিতে আজ ধান বা গম চাষ হয়। বছরে দুই থেকে তিন বার করেই হয়। ফলে চাষি বা সাধারণের পাতে যে 'সাপ্লিমেন্ট ডায়েট' আসত অন্যান্য ফসল বা শাক্‌সবজি থেকে তা উধাও। একইসঙ্গে উধাও এইধরণের ফসলের বিপুল বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাণ্ডার। লেখক বিভিন্ন তথ্য, লেখচিত্র-এর সাহায্যে 1950-51 সাল থেকে 2000-01 অব্দি ভারতের কৃষি ব্যবস্থার চালচিত্র তুলে ধরেছেন।

একই সঙ্গে সেচের আওতায় এসেছে প্রচুর জমি। তাই, বাঁধ, সেচখাল আর জলাধারের বন্যা ভারতজুড়ে, আর তাতে পরিবেশ প্রকৃতি জীববৈচিত্র্য গোল্লায় যাক তো যাকগে। যদিও সুরাহা হয়নি প্রকৃত বন্যা পরিস্থিতির। কৃষি চালচিত্রের বিভিন্ন তথ্যই বলে দিচ্ছে জমির পর জমিতে চাষ হলেও উচ্চ ফলনশীল বীজ, ঢালাও সার, সেচের জল এবং কীটনাশকের বিপুল সমাবেশ সত্ত্বেও গত শতকের নব্বয়ের দশক থেকে এই দশকে উৎপাদন (বিশেষ করে ধান ও গমের) ভীষণই কম। ফলে, সব মিলিয়ে 'সবুজ বিপ্লব' সবুজ বা সোনালি কোনো স্বপ্নই দেখাচ্ছে না, উলটে দূষণে ছয়লাপ চারদিক, বিপর্যস্ত ইকোসিস্টেম, খাদ্য-খাদকের সহজ-সরল সমীকরণ উলটে গেলে যা হয়, তার ফল ভোগ করছি আমরা সবাই। বইটির নামকরণেই লেখক স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চেয়েছেন এখনই এই অতি সর্বনাশা শিল্প-চাষাবাদ থেকে বেরিয়ে আসা উচিত।

❑ *Industrial Vs Ecological Agriculture*
Debal Deb
(Centre for Interdisciplinary Studies,Kollkata)
Navadanya
(Research Foundation for Science, Technology and Ecology, New Delhi), 2004, পৃ. 80।

দরকার প্রকৃতিবান্ধব চাষাবাদ। বইটিতে সেই চাষাবাদ সম্পর্কে রয়েছে অতি সুন্দর নির্দেশ, তথ্য-বিশ্লেষণ এবং আলোচনা। হ্যাঁ! জনসংখ্যার বিপুল চাপ সত্ত্বেও এই পদ্ধতিতে চাষ করে প্রতিটি মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া সম্ভব তো হবেই, একই সঙ্গে বাঁচবে প্রকৃতি পরিবেশও। বিভিন্ন দেশের চাষাবাদ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান রয়েছে গোটা বইটি জুড়েই। কিউবা দেশটি খুবই ছোট। আমেরিকার দাদাগিরির ফলে অর্থনৈতিক অবরোধের দরুন এই ছোট দেশটির বেহাল, বিপর্যস্ত অবস্থার কথা আমরা সবাই জানি। এও জানি কিভাবে এই দেশটি সবাইকে অবাক করে আজও মাথা উঁচু করে বেঁচেবর্তে আছে। শুধু তাই-নয়, কিউবাই আমাদের পথ দেখিয়েছে, কীভাবে 'স্মল ফার্মিং' ব্যবস্থার মাধ্যমে জৈব চাষ করে গোটা দেশের মানুষকে খাওয়ানো যায়। এমনকী, বাইরেও রপ্তানি করা যায়।

হাতের কাছে থাকা একেবারে নির্ভরযোগ্য এই উদাহরণ সত্ত্বেও কি আমরা পরিবেশ-প্রকৃতি ধ্বংসকারী কৃষিব্যবস্থাতেই আটকে পড়ে থাকব? আর বিভিন্ন বহুজাতিক অ্যাগ্রোফার্মগুলোকে লাল কার্পেট পেতে দেব 'সোনার হরিণ' আমাদের এই দেশটার প্রকৃতিক সম্পদ যাতে অবাধে লুঠ করে নিয়ে যেতে পারে।

'নবধান্য'-র (দিল্লীর) অন্যান্য প্রকাশনার মতো এই বইটিরও মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ সুন্দর ও যথাযথ। কিন্তু মাত্র আশি পৃষ্ঠার বইতে নটি ভুলের শুদ্ধিপত্রটি (সবগুলোই মুদ্রণজনিত নয়) হয়তো না-হলেও চলত অন্তত আমাদের অভ্যস্ত ভুলের চোখ বাড়তি কিছু দাবি করত না। তবে একটি বর্ণানুক্রমিক সূচি থাকলে ভালো হতো। তবে সব মিলিয়ে বলা যায় বইটি অত্যন্ত সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয়, সামাজিক আন্দোলনের কর্মীদের কাজে তো আসবেই এমনকী বিজ্ঞানী বা গবেষকরাও এর থেকে যথেষ্ট উপকৃত হবেন বলে মনে হয়।

সোমা বসু

অ্যান্টিবায়োটিক ও উদ্ভিজ্জ ওষুধের কথা

কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলো সামাজিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই বিষয়ের কোনো বক্তব্য যদি ব্যাপকভাবে প্রচার করা যায় তবেই তার সাফল্য পাওয়া যেতে পারে এবং সামাজিকভাবে একটা ভূমিকা পালন করা যায়। বিশেষ করে বিষয়টার চেহারা যদি সামাজিক সমস্যা বা ব্যধির আকার নেয় তবে তো প্রচারের কাজটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়, অবশ্যই বোধগম্য হওয়াটা প্রাথমিক শর্ত এক্ষেত্রে। সেই নিরিখে বাংলাভাষায় এরকম বিষয়ের একটি বই পাওয়াটা সত্যিই খুব দরকারি।

বইটিতে দুটি অধ্যায় করা হয়েছে। এক, "অ্যান্টিবায়োটিক যখন কাজ করে না," এবং দুই, "গাছ গাছড়া থেকে ওষুধ প্রয়োজনীয়তা ও সমস্যা।" বইটির নামকরণ, অধ্যায় ভাগ ও বিষয়বস্তু অনেক জায়গাতে সামঞ্জস্যপূর্ণনয়।

বইটির প্রথম অধ্যায়ে অ্যান্টিবায়োটিক সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে যেটা সমাজকর্মী বা স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে খুবই মনোগ্রাহী হবে। তবে "অ্যান্টিবায়োটিক কিভাবে জীবাণুকে" প্রতিরোধ শক্তিধর করে তোলে তার আলোচনায় ব্যাকটিরিয়া কোষের যে বিশদ বিবরণ আছে, সেটা কোনো সাধারণ পাঠক কোনো সামাজকর্মীকেও খুব একটা আগ্রহী করবে না। আবার এত কম পরিসরে জীবাণু কোষের কতগুলি জটিল প্রক্রিয়াকে বুঝিয়ে বলাও বেশ কঠিন। সর্বোপরি বিষয়টার বোধগম্যতা প্রাথমিক কিছু জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। এর থেকে অ্যান্টিবায়োটিককে সত্যিকারের জীবনদায়ী ওষুধ-এর মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে যে অংশে "যথেচ্ছ ব্যবহারের" উল্লেখ আছে সেটা খুবই মনোগ্রাহী এবং লেখনী শৈলীও চমৎকার। আমরা যারা শহরবাসী তাদের কাছে খুবই পরিচিত চিত্র।

❑ *অ্যান্টিবায়োটিক ও উদ্ভিজ্জ ওষুধ*
মাধব চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক : জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, আগরতলা, ত্রিপুরা
পৃষ্ঠা : 32 (মলাটবাদে) দাম : 20 টাকা

এবং সমস্যা বেশিরভাগটাই সেখানে। মুখবন্ধে বলা ব্যবহারে জিনিস সম্পর্কে জানা ও তার থেকে সৃষ্ট সমস্যা জানলে যে ব্যবহারের সুফল-টুকু পাওয়া যেতে পারে তা সত্যি। কিন্তু অকারণ ভয় পাওয়ানোর উদ্দেশ্য লেখকের নেই বলে অঙ্গীকার থাকলেও, সেটা থেকে মুক্তি পাওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়। যেমন দাঁতের চিকিৎসা বা জীবাণুনাশক সাবান ব্যবহার করতে গিয়ে কতটা অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধকারী জীবাণু বংশ বৃদ্ধি করে ফেলেছে ভাবতে গিয়ে কেউ আতঙ্কিত হয়ে পড়তেই পারে। তবে সেই নিরিখে ওগুলোর ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হলে (যেটা আমার মনে হয় প্রয়োজনীয়) সঠিক পরিসংখ্যান চাই যেটা বইটিতে দেওয়া হয়নি। বরঞ্চ কি করা উচিত, কি করা উচিত নয় অংশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

"অ্যান্টিবায়োটিক যখন কাজ করে না" অধ্যায়ের পরিশেষে যে ছবিগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো খুব বেশিরকম একঘেয়োমিতে ভরা। মজা করে অন্যরকমভাবে পরিবেশন (কার্টুন) করলে হয়তো মজাই পাওয়া যেতে পারত। কিন্তু বিষয়টা বোঝার ক্ষেত্রে এই ছবিগুলো দিয়ে খুব একটা লাভবান হওয়া যাবে না। এই ছয় পৃষ্ঠা শুধু বইটির কলেবর বৃদ্ধির ক্ষেত্রেই ভূমিকা পালন করেছে।

বইটির দ্বিতীয় অধ্যায় "গাছ গাছড়া থেকে ওষুধ : প্রয়োজনীয়তা ও সমস্যা" শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে। অথচ প্রয়োজনীয়তা অংশটি আলোচনায় অনুপস্থিত। আলোচনায় যেটা হয়েছে সেটা "জনপ্রিয়তা" নিয়ে। যদিও জনপ্রিয়তা আর প্রয়োজনীয়তা সমার্থক নয়। জনপ্রিয়তার নানা কারণগুলো বইতে বেশ ভালোভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে এবং এর বাইরে কিছুই কুসংস্কার এবং অবৈজ্ঞানিক চিন্তা, ভাবনাও আছে এই জনপ্রিয়তার মূলে। সেদিক থেকে "প্রয়োজনীয়তা" নিয়ে আলাদা করে আলোচনা খুবই জরুরি ছিল। কেননা এই জনপ্রিয়তাটাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে, কুসংস্কার মুক্ত প্রয়োজনীয় দিকটা আরও গভীরভাবে রেখাপাত করা যেত।

"সমস্যা" নিয়ে পরের অংশে অনেক বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে যার বেশিরভাগটাই আসলে ভেজাল সংক্রান্ত, তা গাছ না চিনে তার প্রয়োজনীয় অংশে বের না করতে পারা হোক বা অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ মিশিয়ে তার কার্যকর ক্ষমতা তৈরি করাই হোক!

আসলে এই অংশে কোনো দিশা ঠিক করে লেখা হয়নি বলেই "জনপ্রিয়তার" অধ্যায়ে "মধু তুলসীপাতা"-র কথা বলা হলেও বাকি আলোচনাটা মূলত শিশি ভর্তি বা কৌটো ভর্তি ওষুধের কথাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ (Patent) "পেটেন্ট" ওষুধ নিয়েই আলোচনা হয়ে গেছে, এবং দৃষ্টিকটুভাবে চীনা পেটেন্ট ওষুধের খারাপদিকের উল্লেখ শুধু করা হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। অথচ বিষয়ের নিরিখে এটা একেবারেই গুরুত্বহীন।

এছাড়া বইটির বিভিন্ন জায়গায় যে পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে তা যদি বোধগম্যতার পর্যায়ে নিয়ে যেতে হয় তবে পাশাপাশি আরও কিছু পরিসংখ্যান (comparative study) দেওয়ার প্রয়োজন আছে; আর যে কোনো পরিসংখ্যানেরই সূত্র থাকা উচিত, বিশ্বাস-যোগ্যতার প্রয়োজনে। পরবর্তী সংস্করণে এই দিকটি একটু নজর দিলে ভাল হবে।

পরিশেষে বলার প্রয়োজন আরও একটা দিক নিয়ে তা হল এ ধরণের বইয়ের প্রচার পাওয়ার ওপরেই কিন্তু বিষয়টার সার্থকতা নির্ভর করে। সেক্ষেত্রে আরও কম দাম করে যদি আরও ব্যাপক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় তবেই বোধ হয় এই "বিশ্বব্যপী" সমস্যার হাত থেকে কোনো একদিন একটু সরে আসা যাবে। অবশ্য লেখক যদি সেটা মনে করেন তবেই।

স্বপন দাস

গ্রাহক ও পাঠদের প্রতি

বিওবির প্রকাশ এখনও নিয়মিত করা যায়নি। তবে চেষ্টা চলছে। আপনাদের সহযোগিতা ভীষণ প্রয়োজন। আর্থিক অনুদান ও সদস্যচাঁদা যেমন অপরিহার্য তেমনি অপরিহার্য আপনাদের মতামত, চিঠিপত্র, লেখা। ডাকযোগে এবং/অথবা ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করুন। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় (সাড়ে ছটা-সাড়ে আটটা) 2/1A আশুতোষ শীল লেন কলকাতা 700 009 'আড্ডায়' আসার আমন্ত্রণ রইল।

সত্যিই কি আজও পুকুর আমাদের !

আজ ভি খ্যাড়ে হ্যায় তালাও— আজও দাঁড়িয়ে আছে পুকুর। শুধু দাঁড়িয়ে নেই, মাথা উচু করে প্রমাণ করে দিচ্ছে আজ থেকে অনেক অনেক দিন আগে যখন আজকের মতো উন্নত প্রযুক্তির যুগ নয়, যখন মানুষের প্রধান ক্ষমতা তার ইচ্ছাশক্তি তখন মানুষ ভেবেছে জল আমাদের কতটা প্রয়োজনীয়। সাধারণ মানুষ থেকে রাজা বাদশা সকলের মিলিত প্রচেষ্টা জল কিভাবে সংরক্ষণ করা যায়, সেই দিনের ইতিহাস অনেক যত্ন করে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন অনুপম মিশ্র। তিনি লিখেছেন হিন্দি ভাষায়। আমাদের বইটি পড়তে সুযোগ করে দিয়েছেন নিরুপমা অধিকারী। তাঁর অনুবাদে, নামকরণ *আজও পুকুর আমাদের*।

আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রদেশে জল হাওয়ার এতটাই বৈচিত্র্যময় যে কোনো জায়গার এক বৎসরের বৃষ্টিপাত কোনো জায়গার একদিনের বৃষ্টিপাতের সমান। দেশের অনেক অংশই মূলত বৃষ্টিনির্ভর। তাই অনুপম মিশ্র দেখিয়েছেন, বৃষ্টির জলকে ধরে রাখার চেষ্টা কিভাবে হয়েছিল।

পুকুর সব থেকে প্রাচীন ও সহজ পথ। পুকুর সৃষ্টির প্রসঙ্গে লেখক নানা অঞ্চলের সুন্দর গল্প শুনিয়েছেন। সাধারণ মানুষ থেকে রাজা-রানি এমনকী দেবতারাও বাদ যায় নি সেই গল্প থেকে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে যেখানে জনবসতি খুব কম বা প্রায় নেই বললেই চলে, সেই সব অঞ্চলে যে জলাধারগুলি তৈরি হয়েছে, জনশ্রুতি সেগুলি দেবতারা তৈরি করেছেন। আসলে ভূ-পৃষ্ঠের আলোড়নে সেগুলি তৈরি। বিহার-ঝাড়খণ্ড-এর তোপচাঁচি-তে চারিদিকে পাহাড় মধ্যে জলাধার প্রকৃতির সৃষ্টি। উপত্যকা অঞ্চলে দুটি পাহাড়ের মধ্যের অংশে বাঁধ দিয়ে জলাধার তৈরির প্রচেষ্টা প্রাচীন কাল থেকে অধুনিক কালেও দেখা যায়। জল-কে বাঁধ দিয়ে রাখা। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া অঞ্চলে অনেক বড় পুকুরকে বাঁধ বলার প্রচলন, যেমন 'সাহেব বাঁধ'।

পুকুর সৃষ্টির সঙ্গে ধর্মকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অনেক সময়। পুকুর তৈরি ধর্মের কাজ। কখনো-বা রাজারা পুকুর তৈরিতে উৎসাহ জুগিয়েছেন জমির খাজনা মুকুব করে বা পুরস্কার ঘোষণা করে। কখনো-বা উপহার দেওয়া হয়েছে পুকুর। কোনো বিশেষ ঘটনাকে স্মরণীয় করতে তৈরি হয়েছে বড় পুকুর।

পুকুরকে কেন্দ্র করে অনেকসময় গড়ে উঠেছে জনবসতি। শুরু হয়েছে বন্ধ্যা জমিতে কৃষিকাজ। উন্নত হয়েছে অর্থনৈতিক অবস্থা। বিদায় দেওয়া গেছে রুক্ষতা, অনাহার, নিজের বসতি ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাবার প্রবণতা।

আমরা সাধারণত জল পেয়ে থাকি তিনটে উৎস থেকে— বৃষ্টির জল, বরফগলা নদীর জল, এবং মাটির তলার সঞ্চিত জল। যে-সব অঞ্চল দিয়ে বরফগলা নদীর জল বয়ে চলে সেখানে সমস্যা কম। কিন্তু বেশিরভাগ নদী বৃষ্টিনির্ভর। বছরের কয়েক মাস মাত্র জল থাকে। জল সংরক্ষণ হয় না। অধিকন্তু হঠাৎ আসা জলে বন্যার আশঙ্কা থেকে যায়।

মাটির তলার সঞ্চিত জল প্রাচীনকালে কূপ-এর মাধ্যমে ব্যবহার হতো। অনেক কূপ খনন করা হতো পুকুরের কাছাকাছি। পুকুরের মাধ্যমে মাটির তলায় বেশ কিছু পরিমাণ জল সঞ্চিত হয়। কূপ থেকে অতিরিক্ত মাত্রায় জল তোলা সহজ কাজ হতো না। পরবর্তীকালে মাটির তলার জল যথেচ্ছ ব্যবহার শুরু হওয়াতে জলস্তর ক্রমে নামতে থাকে। বর্তমানে তা বইটির প্রস্তাবনা লেখক সুনীল কুমার মুন্সীর ভাষায়, "অতি ব্যবহারে সেই ভাণ্ডারে টান পড়েছে, জল গরল হয়ে উঠে আসছে কোনো কোনো জায়গায়।"

বইটি আমাদের ভাবতে সাহায্য করবে অনেক অনেক দিন আগে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। মানুষের বাঁচার জন্য জলের ওপর তার অধিকার মানুষ আজ কীভাবে হরণ করছে। হয়তো জীবকুলকে বাঁচার জন্য পুরনো দিনের মানবিক চিন্তায় আমাদের ফিরতে হবে। পরিবেশের এই পরিবর্তনের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য সুন্দর সংযোজন এই বইটি।।

পুনশ্চ:

বর্ধমান জেলার মেমারি থানার ঘোষগ্রামে একটি পুকুর সংস্কারের জন্য মাটিকাটার সময় পুকুরের মধ্যে ১১টি কূপের অবস্থান লক্ষ করা গেছে। পুকুরের জল কম বেশি হলেও গ্রীষ্মের সময় পুকুরটির জল শুকায় না।

ওমপ্রকাশ চক্রবর্তী

❑ *আজও পুকুর আমাদের*
অনুপম মিশ্র [বাংলা অনুবাদ : নিরুপমা অধিকারী]
প্রকাশক : আশাবরী, নেতাজি সুভাষ রোড, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ
পৃ. 79 দাম : 60.00

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী সম্পর্কে কয়েকটি কথা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী-র রজতজয়ন্তী বর্ষের সংখ্যাটি এক মন কেমন করা ভাল লাগা উপহার দিল। পরিবেশ এবং সমাজ সংক্রান্ত নিবন্ধগুলো তো নিজগুণেই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ চিঠির অবতারণা মূলত তিনটে লেখার (আমাদের কথা, বন্ধু সম্মিলন, *বিওবি*-র ভবিষ্যৎ) প্রেক্ষিতে। তিনটে লেখাই মন ছুঁয়ে যায়। একটু মতামত দিতে চাই সুদীপ্ত সরস্বতীর লেখা প্রসঙ্গে।

বিওবি-র ভবিষ্যৎ কী তা সময়ই বলবে। আমি শুধু *বিওবি*-র অতীত নিয়ে দুএকটা কথা উল্লেখ করতে চাই। সুদীপ্ত সরস্বতী অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে *বিওবি*-র গত পঁচিশ বছরের কাজের বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন করেছেন। পরিবেশ আন্দোলনে *বিওবি*-র বিশেষ ভূমিকার কথা, বলার অপেক্ষা রাখে না। সুন্দরবন সার কারখানা গড়ে তোলার চেষ্টার বিরুদ্ধে যে অভূতপূর্ব আন্দোলন হয়েছিল তাতে *বিওবি* ছিল প্রধান সহায়ক। সুদীপ্তবাবু সঠিকভাবেই লিখেছেন, এই আন্দোলনের সমস্ত দিক নিয়ে কোনো তথ্যভিত্তিক বিস্তারিত ইতিহাস কিন্তু এখনও কোথাও প্রকাশিত হয়নি। এই অভাববোধ থেকেই আমি এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেছি। *বিওবি*-র রবীন মজুমদার এবং বিশুদ্ধানন্দ পুরকায়েতের সহৃদয় সহযোগিতায় তথ্য সংগ্রহ করে, লক্ষীকান্তপুরে গিয়ে আন্দোলনের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে আমি ইতিহাস অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি। এ-প্রসঙ্গে আমি ভিন জায়গায় বলেওছি। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ষাটতম অধিবেশনে কেরলের কালিকটে আমি বলেছিলাম 'The Fight Against Pollution: A Success Story of Sundarban' (ডিসেম্বর 1999)। পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম Orientation Programme-এও বলি : An Environmental Movement Against the 'Greater Common Good' (ফেব্রুয়ারি 2003)। ইতিমধ্যে হুগলি মহসীন কলেজে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পশ্চিমবঙ্গ সমাজবিজ্ঞান কাগ্রেসে বলি : 'অন্তেবাসীর আন্দোলন' (নভেম্বর 2002)। ঐ অধিবেশনের সভাপতি অধ্যাপক শুভেন্দু দাশগুপ্তর মন্তব্যে বিষয়টি আলোচনাসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই লেখাগুলোর সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হলেও পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধগুলো প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। (সেপ্টে. 2004-এ *অন্তেবাসী : সংস্কৃতি* গ্রন্থে 'অন্তেবাসীর আন্দোলন' নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে।)

এছাড়া আর বাকি যে পাঁচটি বিষয়ে সুদীপ্তবাবু—*'বিওবি'*-র ভূমিকা কী ছিল এবং ভবিষ্যতে কী হতে পারে—মত প্রকাশ করেছেন, সেই বক্তব্যের সঙ্গেও আমি একমত। তবে আর একটি বিষয়ে *বিওবি*-র ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে আরও বিশদে আলোচনা করা অবশ্যই উচিত, সুদীপ্তবাবু উল্লেখ করেছেন মাত্র। অন্য বিষয়টি হল বিদ্যালয় স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষায় ফাঁকফোঁকর অনুসন্ধান করা। *বিজ্ঞান শিক্ষা প্রাথমিক হালচাল* এবং *বিজ্ঞান শিক্ষা মাধ্যমিক হালচাল* শিরোনামে *বিওবি* যে জরুরি কাজটা করেছিল তা আজও প্রাসঙ্গিক। এখন যখন পশ্চিমবঙ্গসহ বিভিন্ন রাজ্যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রথাগত বিজ্ঞানশিক্ষার ফাঁক ক্রমে নষ্ট হচ্ছে; হাতেকলমে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে তখন *বিওবি*-কে কেমন যেন দিশারী বলে মনে হয়। আর এটাও তো সত্যি, এ ক্ষেত্রে মধ্যপ্রদেশের 'একলব্য'র কর্মকাণ্ড, প্রথম বাংলা ভাষায় পড়েছিলাম *বিওবি*-রই পাতায়, সুভাষ গাঙ্গুলির লেখায়।

কাজেই, সব মিলিয়ে বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান আন্দোলনে *বিওবি*-র ভূমিকার মূল্যায়ন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এক কাজ। এই কাজ বিশদে করা দরকার। আমি অত্যন্ত ছোট আকারে এই মূল্যায়নের একটা বিনীত প্রয়াস করেছি 2004-এ একাদশ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেসে। আমার নিবন্ধের শিরোনাম ছিল : 'পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান আন্দোলনে বিজ্ঞান পত্রিকা : *'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'* এবং *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*-র ভূমিকা' (ফেব্রুয়ারি 2004)।

এছাড়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পি. এইচডি. ডিগ্রির জন্য জমা দেওয়া আমার পূর্ণাঙ্গ গবেষণা সন্দর্ভেও (*A Hirtorical Study of the Science Movements in West Bengal 1947-1997*) *বিওবি*-র কথা আলোচনা করেছি। সেখানে *বিওবি* ছাড়াও সুদীপ্তবাবু কথিত অন্য নানা প্রসঙ্গও এসেছে; যেমন পারমাণবিক অস্ত্রশক্তি বিরোধী আন্দোলন, জনস্বাস্থ্য

আন্দোলন, যুক্তিবাদী আন্দোলন প্রভৃতি। এসেছে পশ্চিমবঙ্গে 'ধারণা' এবং 'আন্দোলন' হিসেবে 'গণবিজ্ঞান'-এর বিকাশের ইতিহাস, আলোচিত হয়েছে 'বিজ্ঞান আন্দোলনে রাজনীতি' প্রসঙ্গও। ভবিষ্যতে, *বিওবি*-র বন্ধুদের সঙ্গে এ-সমস্ত বিষয়ে ভাবনা ভাগ করার ইচ্ছে রইল।

এই সুযোগে, *বিওবি*-র বন্ধুদের, বিশেষ করে রবীন মজুমদার এবং রবীন চক্রবর্তীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। তাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দিলে (আমার গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয়) *বিওবি*-র পুরনো সংখ্যাগুলো দেখার জন্য ধুলো ঘাঁটার সুযোগ আদৌ হতো না।

ধন্যবাদান্তে—

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়
ইতিহাস বিভাগ,
নিউ আলিপুর কলেজ, কলকাতা

পৃথিবী পেরিয়ে.....

গত সেপ্টেম্বর 2004-এর 'জল মিলিলেই মঙ্গল' শীর্ষক সম্পাদকীয় পড়ে বোঝা গেল আর এইচ. জি. ওয়েলস-এর গল্পের ফানুস নয়, নাসার আশা শুধু কল্পনায় ঠাসা নয়, অনায়াসেই মর্ত্যবাসীর অমর্ত্য জয়। দু'হাজার চৌত্রিশ—মঙ্গল-কাব্য ফিনিশ। *'Terra Incognita'* হতে চলেছে *'Terra Cognita'*. অজানা দেশ—জানা হলো শেষ।

> চল্লিশ বছর ধরিয়া মঙ্গলমুখী মহাকাশযানগুলির লক্ষ্য ওই গ্রহকে মানুষের অধিগম্য করিয়া তোলা। সেই লক্ষ্যে মঙ্গল যেন সমানেই বাদ সাধিতে চায়। মানুষের এই আকাশ ছোঁয়া স্পর্ধা প্রতিহত করিয়া নিজের সুদৃঢ়তা অটুট রাখিতে চায়। ইহাও যেন এক যুদ্ধ—গ্রহের সঙ্গে গ্রহের, মানুষের সঙ্গে মহাকাশের প্রতিবেশীর, সভ্যতার স্পর্ধার সঙ্গে মহাজাগতিক নিয়তির যুদ্ধ। ...যেন সেই যুদ্ধের প্রেক্ষিতেই শক্তিমানতম দেশের প্রেসিডেন্ট জর্জ ডবলিও বুশ দুইটি যুদ্ধ সমাপন করিয়া... দুনিয়াময় বার্তা পাঠাইয়াছেন : এবার সর্বশক্তিতে নজর ফেরানো দরকার মঙ্গলগ্রহের দিকে।"

বুশের বন্দুকের crossline-এ একি নতুন বিহঙ্গ?

ভারতীয় 'ক্ষত্রিয়' মঙ্গল, রোমানদের রণদেবতা, গ্রীক পুরাণে Ares বা Mars হচ্ছে God of War — সংক্ষেপে বলা যায় G.W এখন মোস্টলি ওয়ানটেড বাই মর্ত্যের 'যুদ্ধদেবতা' G.W. Bush। বাগদাদের বাঘ মেরে, কাবুল কান্দাহার কাঁপিয়ে এখন ভিন্ন কক্ষপথে তার কঠোর দৃষ্টি।

নাসার বিজ্ঞানীদের জিগীষার সমান্তরাল কোনো সুদূরপ্রসারী সাম্রাজ্যবাদের সুপ্ত 'সদিচ্ছা' তার অহংকারের সিন্দুকে শাণিত হচ্ছে। মঙ্গলেও অমঙ্গল? নাকি যুদ্ধ-ক্লান্ত সম্রাট অশোকের মতো অন্য 'জগতে' ...মহাকাশে মহানির্বাণ!

দুই 'প্রফেশনাল' রোবটিক জিওলজিস্ট মঙ্গলের মাটি ছিঁড়ে, পাথর আঁচড়ে অতীত প্রাণের দলিল—জলের 'ফসিল' এর স্মৃতিচিহ্নই নয়, ক্যামেরার চাতক-চোখ 'অ্যারাবিয়া টেরায়' জলীয় বাষ্পের তাজা গন্ধও পেয়েছে। পৃথিবীর আরব ভূমিতে জলের আকাল থাকলেও মঙ্গলের 'দি গ্রান্ড ক্যানিয়ন' অ্যারাবিয়া টেরায় (লাটিন *terra* অর্থে মাটি) বোধ হয় আরবের তেলের মতোই জলের ভাণ্ডার। 'সেলুকাশ'— কি বিচিত্র বৈপরীত্যের এই দেশ! মহাকাশের মরুভূমিতেও মরুদ্যান। তেলে-জলে না মিশলেও দুই বিপরীতধর্মী তরলের প্রতিই প্রেসিডেন্টের পিয়াস মেটানোর passion থাকতেই পারে! "চক্ষে আমার তৃষ্ণা।"

যাই হোক, প্রসঙ্গক্রমে ঐ সম্পাদকীয়তে আরো জানা গেল টানা বারো মাসের মঙ্গল-অভিযানে প্রচুর জলের দরকার। কিন্তু বহুদিন আগে আমেরিকার এক বিজ্ঞান-সাংবাদিক জিরাল্ড ও' নীল-এর *Rife on Mars* (Life নয় কিন্তু) গ্রন্থে পড়েছিলাম (ছবিসহ) ভাবী অ্যাস্ট্রনটরা কিভাবে তাদের মূত্র recyle করে বারবার পান করবে জলের অভাব মেটাতে।

নিউ জেনারেশন আকাশচারীরা রাজি না হওয়ায় (এই recyle-এর যুগেও) সম্ভবত ওই পরিকল্পনা বাতিল। মহাকাশচারী হলেও মানুষ, সবাইতো আর 'বামাক্ষ্যাপা' বা 'মোরারজি দেশাই' নয়!

লাল টকটকে, পুরু আয়রন অক্সাইডের ধুলোর তীব্র গ্লোবাল মরুঝড়ে প্রতিহত—প্রতিফলিত সূর্যালোকেই (Albedo) পৃথিবীর চোখে ও চেতনায় মঙ্গলের রাগী ও

রক্তবর্ণ রূপ। "যেন এক মহাকাশীয় কক্ষপথে Socialism এর লাল (Heart-red color) ধ্বজা উড়িয়ে তার বিচরণ।" (Kevin Zahnle, "Decline and Fall of the Martian Empire", *Nature*, July 2001) NASA Ames Research Center-এর বিজ্ঞানী ঐ প্রবন্ধেই (নিজেরই প্রতিষ্ঠানের মূলস্রোতের প্রতিপক্ষ হয়ে) কামনা প্রকাশ করেছেন, "মঙ্গল যেন বন্ধ্যা (sterile) হয়। কারণ Genocide এর পর 'Planetocide' নামের নতুন কোনো শব্দ ডিকশনারিকে ডাইজেস্ট করতে না হয়, হিটলারও যে 'শব্দ' হাতিয়ে নিতে পারেনি।

আর ওয়েলস এর *The War of the Worlds* পুস্তকে মঙ্গলের পক্ষ সমর্থন করে সোজা সাপটা বক্তব্য : ইউরোপীয় অধিবাসীরা মাত্র পঞ্চাশ বছরের পরিসীমায় যে বর্বরতায় তাসমানিয়ানদের (একদম মানুষেরই প্রজাতি—Homosapiens sapiens) 'স্ব-ভূমি' থেকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করেছে, 'মোঙ্গলিয়ানরা' যেন পিছপা না হয়ে, সমশক্তিতে পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

সম্ভবত নিউটনের বল ও গতি সংক্রান্ত বিখ্যাত তৃতীয় সূত্র মেনে।

পৃথিবী নামক গ্রহের জিম্মাদার, যার প্রবল পরাক্রমে আঁৎকে ওঠে আঁতুরের শিশু থেকে, ক্রুশবিদ্ধ ক্ষমাশীল 'অতীতের' যিশুও। সেই 'জাঁহাপনা' জর্জ বুশকে আবেদন (না অনুযোগ?) মঙ্গলে তুমি চেয়ো না—তুমি তাকাও বরং China.

এ নিঃসীম নীলিমার এক নগণ্য নৃপতি, সিঁদুরের টিপের মতো রাতের আকাশে, মঙ্গল আমাদেরই প্রতিবেশী। মাথায় সফেদ (Polar icecaps) উষ্ণীষ। কেউ বলে বীর, আর কেউ বলে গ্রীক উপকথায় তুলিতে আঁকা নেহাতই এক 'সাজানো' নায়ক। থাক না সে নিজমনে। আমরা শুধু তাকে পৃথিবী থেকেই তাকিয়ে দেখি।

নিখিলেশ পাল
(অ্যাস্ট্রোনমিকাল টেলিস্কোপ মেকার)
চকদীঘি, বর্ধমান

AIMBEE

36/1/1 Tangra Road, Kolkata 700 015 Ph : 23293757

Service For

Pest Control Dusting and Clearing Book Preservation
Extermination of White Ant Treatment
Termite Control

General Order Supply

References :

Calcutta University (Deparments, Laboratories, Libraries, Account offices etc.)
Colleges (Library & Laboratories)
Banks
Central Governments Offices
West Bengal Governments Offices

With best compliments from

LOKNATH UNIQUE COMPOSITES PRIVATE LIMITED

FD 320, SECTOR III, SALT LAKE
KOLKATA 700 091

GOOD NEWS FOR ARCHITECTA & BUILDERS !

FRP COMPOSITE DOORS CONFORMING TO IS-4020, WITH DST TECNONLOGY (RV-TIFAC) NOW BEING MANUFACTURED IN KOLKATA—THE ONLY MANUFACTURER IN KOLKATA. THESE DOORS ARE THE IDEAL REPLACEMENT FOR WOOD. THESE ARE VERY STRONG, FIRE-RETARDANT, TERMITE-PROOF & WATER-RESISTANT.

PLEASE DIAL 2358 9839, 22162974
FAX 2237 7503
e-mail : luc@cal3.vsnl.net.in

VIJNAN O VIJNANKARMI RS. 20.00 VOL. XXVI NOS. 1-4
RN. NO. 34929/79 JANUARY - DECEMBER 2004

বিগত তেসরা জুলাই, দুহাজার চার *বিও/বি*র 'নবায়ন' নিয়ে কথা বলতে এসেছিলেন প্রায় সত্তর জন। অনেকে অনেক মতামত দেন। অনেকরকম সহযোগিতার আশ্বাসও পাওয়া গিয়েছিল। যেমন, অন্তত চারজন বলেন যে, প্রাথমিকভাবে দুবছর বার্ষিক দুহাজার টাকা করে সাহায্য দিতে তাঁরা প্রস্তুত। ধারাবাহিকভাবে কিছু বিজ্ঞাপন জোগাড় করে দেবার কথা বলেন তিনজন (দুজন সে প্রতিশ্রুতি পালনও করেছেন ইতিমধ্যে); অন্তত পাঁচজন প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্ট কিছু সময় দেবার প্রতিশ্রুতিও দেন। *বিও/বি*র গ্রাহক-পাঠক সংগ্রহে সাহায্য করার কথা দেন অনেকেই। এইসব সহযোগিতা সঠিকভাবে গ্রহণ করা এখনও সম্ভব হয়নি, ন্যূনতম পরিকাঠামোর অভাবে সভায় সার্বিক কোনও সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়নি যদিও সকলেই সহমত ছিলেন যে *বিও/বি*র বাঁচা দরকার। *বিও/বি* নিয়মিত প্রকাশিত হোক এ-ব্যাপারেও কোনও দ্বিমত ছিল না, কিন্তু কিভাবে *বিও/বি* তার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেও যুগোপযোগী হয়ে উঠে একটি সামাজিক ভূমিকা পালন করতে পারে তা নিয়ে *বিও/বি*র বর্তমান কর্মীদের মধ্যেও বিস্তর মতভেদ।

আমাদের মনে হয়েছে—শুধুমাত্র অফিস, টাকা, লেখা বা কর্মীর অভাবই নয়, রোগের মূল আরও গভীরে। সেসব নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি *বিও/বি* চলতে থাকুক। এবছরও *বিও/বি* একটি সংখ্যাতেই সীমিত রইল। তবে আশা করা যায়, এই সংখ্যাতেই আলোচনাসভা থেকে সংগৃহীত উৎসাহের ছোঁয়া পাবেন পাঠক। আপনি *বিও/বি*র পাঠক বা অনুরাগী হোন বা না হোন, এই সংখ্যা যদি পড়েন একটু সাড়া দিন, আপনার মতামত নির্দ্বিধায় জানান। লেখাপত্রও পাঠাতে পারেন।

ডাক যোগাযোগ
প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী,
P 252, লেক টাউন, ব্লক A, কলকাতা 700 089

সাপ্তাহিক বৈঠক
কালধ্বনি পত্রিকার অফিস, 2/1A আশুতোষ শীল লেন, কলকাতা 700 009
প্রতি বৃহস্পতিবার (সন্ধ্যে সাড়ে ছটা থেকে সাড়ে আটটা)
(ফোন : সুভাষ গাঙ্গুলি, 2359 0297 শনি-রবি বা অন্যদিন সন্ধ্যা সাতটার পর)
ইমেল : b_o_b2004@hotmail.com

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে প্রিন্টিং পাবলিসিটি,
117 কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা 700 009 থেকে মুদ্রিত।